জানোয়ারের মেলা



শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগ
৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

জানোয়ারের মেলা

সুকুমার রায়

শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগ ● ৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

প্রকাশক :
দুলাল বল
৮/ এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য : দশ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
অসিত সরকার
তাপসী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৬ শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

পাখির বাসা

মানুষ যেমন নানারকম জিনিস দিয়ে নানা কায়দায় নিজেদের বাড়ি বানায়—কেউ ইট, কেউ পাথর, কেউ বাঁশ-কাদা, কেউ মাটি ; কারও এক-চালা, কারও দো-চালা—পাখিরাও সেরকম নানা জিনিস দিয়ে নানান কায়দায় নিজেদের বাসা বানায়। কেউ বানায় কাদা দিয়ে, কেউ বানায় ডাল-পালা দিয়ে, কেউ বানায় পালক দিয়ে, কেউ বানায় ঘাস দিয়ে ; তার গড়নই-বা কতরকমের—কারও বাসা কেবল একটি ঝুড়ির মতো, কারও বাসা গোল, কারও বাসা লম্বা চোঙার মতো। এক-একটা পাখির বাসা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়, তাতে বুদ্ধিই-বা কত খরচ করেছে, আর মেহনতই-বা করেছে কত। বাবুই পাখির বাসা তোমরা অনেকেই দেখেছ বোধ হয়। কেমন সুন্দর করে শুকনো ঘাস দিয়ে বুনে তার বাসাটি সে তৈরি করে। পাছে কোনো জন্তু বা সাপ বাসা আক্রমণ করে, সেইজন্য বাসায় ঢুকবার রাস্তা তলার দিকে। শত্রুকে জব্দ করবার আর-একটা উপায় তারা করেছে—অনেক সময় বাসার গায়ে আর-একটা গর্তের মতো মুখ তৈরি করে রাখে, সেটা কেবল ঠকাবারই জন্যে, তার ভিতর দিয়ে বাসার মধ্যে ঢোকা যায় না।

টুনটুনি পাখি তার বাসা তৈরি করার আগে দুটি কি তিনটি পাতা সেলাই করে একটি বাটির মতো তৈরি করে ; তার মধ্যে নরম ঘাস পাতা দিয়ে সে তার বাসাটি বানায়। সেলাইয়ের সুতো সাধারণত রেশমেরই ব্যবহারই করে ; কাছে রেশম না থাকলে যে সুতো পায় তাই দিয়ে করে। সেলাইয়ের ছুঁচ হল তার সরু ঠোঁট-জোড়া। বাসাটা অনেকটা দোলনার মতো ঝুলতে থাকে। খুব ছোটো জাতের পাখিরা হিংস্র জন্তু আর সাপ গিরগিটির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে প্রায়ই ঐরকম দোলনার মতো বাসা তৈরি করে থাকে। অনেক জাতের পাখি আবার মাটিতেই বাসা করে ; গাছে বাসা তারা পছন্দই করে না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বাসা তৈরিই করে না। নিজেরা গাছের আড়ালে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকে আর মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে ডিম পাড়ে। মোরগ, তিতির, গেরু এরা সবই এই জাতের। আবার কোনো কোনো পাখি সুন্দর করে লতা পাতা দিয়ে কুঞ্জ-বনের মতো বানায়! অস্ট্রেলিয়া দেশের 'কুঞ্জ-পাখি' (Bower bird) তার বাসার সামনে খুব সন্দর লতা-কুঞ্জ তৈরি করে। পাখিটি আকারে ছোটো বটে, কিন্তু কুঞ্জটি কিছু ছোটো হয় না। এদের আবার রঙচঙে জিনিসের বড়ো শখ ; ভাঙা কাঁচ, পাথর, রঙিন জিনিস, যা সামনে পাবে সব এনে বাসার চারিদিকে সাজিয়ে রাখবে।

কোনো কোনো পাখি থুতু দিয়ে বাসা তৈরি করে। তালচোঁচ পাখি এই জাতের। পালক, ঘাস এ-সব জিনিস থুতু দিয়ে জোড়া লাগিয়ে তার বাসা তৈরি হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জে এক জাতের তালচোঁচ আছে, তারা কেবলই থুতু দিয়ে নিজেদের বাসা বানায়। চীন দেশে এ বাসার খব আদর ; তারা এর ঝোল বানিয়ে খায়। এইজন্য সেদেশে এর দামও খুব বেশি।

অনেক জাতের পাখি কাদা দিয়েও তাদের বাসা বানায়। আফ্রিকার ফ্লামিঙ্গোর বাসা কাদার তৈরি। একটা ঢিপির মতো কাদা সাজিয়ে তার মাঝে একটা গর্ত করে ফ্লামিঙ্গো ডিম পাড়ে। আরো অনেক জাতের পাখিও কাদার বাসা বানায়; তাদের অধিকাংশই আফ্রিকার।

তোমরা অনেকেই বোধ হয় কাঠ-ঠোকরা দেখেছ। এরা ঠোঁট দিয়ে ঠোকর মেরে গাছের গায়ে গর্ত করে তার ভিতরে বাসা বানায়। দুষ্টু ছেলেরা ছানা চুরি করার লোভে কাঠ-ঠোকরার বাসার গর্তে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে অনেক সময় সাপের কামড় খায়, কারণ সাপেরা কাঠ-ঠোকরার বাসা ডাকাতি করে অধিকার করতে বড়ো পটু!

কুমিরের জাতভাই

টিকটিকি, গিরগিটি, বহুরূপী, তক্ষক, গোসাপ এঁরা সকলে হলেন কুমিরের জ্ঞাতিবর্গ। পৃথিবীর যে কোনো দেশে যাও, এঁদের কোনো-না-কোনোটির সাক্ষাৎ পাবেই। কিন্তু সাক্ষাৎ পেলেই যে সবসময়ে তাদের চিনতে পারবে, তা মনে কোরো না। অস্ট্রেলিয়ার সেই কাঁটা-ওয়ালা ভীষণমূর্তি জানোয়ার যে নিতান্ত নিরীহ গিরগিটি মাত্র, এ কথা আগে থেকে না জানলে কি কেউ বুঝতে পারবে? কেবল চেহারা দেখে যদি এর সম্বন্ধে কোনো মতামত দিতে হয়, তা হলে অনেকেই হয়তো বেচারির উপর অবিচার করবে। সমস্ত শরীরটি এর অস্ত্রে আর বর্মে ঢাকা, কিন্তু মেজাজটি যারপরনাই ঠাণ্ডা। দুপুরের রোদে শুকনো বালির উপর এরা পড়ে থাকে, ভয় পেলে তাড়াতাড়ি বালির মধ্যে ঢুকে যায়। অন্য জন্তুর অনিষ্ট করা দূরে থাকুক, সামান্য একটা পাখি দেখলেই এরা পালাবার জন্য ব্যস্ত হয়। এদের প্রধান খাদ্য পিঁপড়ে। সবচাইতে আশ্চর্য এই যে এক বাটি জলের মধ্যে যদি এই গিরগিটি ছেড়ে দাও, তবে দেখতে দেখতে এর গায়ের চামড়া সমস্ত জলে শুষে নেবে। শুকনো বালিতে থাকে কিনা, সবসময়ে তো স্নানের সুবিধা হয় না, তাই একবার স্নান করলেই সে অনেকদিনের মতো জল বোঝাই করে নেয়।

এক সবুজ রঙের জন্তু রয়েছে—মাদাগাস্কারের টিকটিকি। এর বিশেষত্বের মধ্যে পায়ের আঙুলগুলি আর গায়ে রঙের বাহার তা ছাড়া রয়েছে বহুরূপী। বহুরূপীর গুণের কথা তোমরা সকলেই জান। তার সমস্ত গায়ের রঙ সে চট্‌পট্ বদলাতে পারে। চোখে চেয়ে দেখছ তার দিব্যি ঘাসের মতো সবুজ রঙ, হয়তো এক মিনিট বাদেই দেখবে ফ্যাকাশে। তার পর ঘুরে এসে দেখ শুকনো পাতার রঙ কিম্বা সীসার মতো ময়লা। বহুরূপীর চাল-চলন ভারি অদ্ভুত। এক পা নড়তে হলে অতি সাবধানে ধীরে ধীরে সে পা ফেলে; হয়তো একটা পা অর্ধেকখানা তুলে পাঁচমিনিট চুপ করেই রইল। দেখে মনে হয় যেন পা ফেলবে কি না ফেলবে এরজন্যে তার কত হিসাব আর ভাবনাচিন্তা করতে হচ্ছে। এক সময়ে লোকের বিশ্বাস ছিল—অন্তত বিলাতে শিক্ষিত লোকেও এ কথা বিশ্বাস করত যে বহুরূপীরা

শুধু হাওয়া খেয়ে থাকে। এরকম বিশ্বাসের কারণ এই যে, বহুরূপী একে তো খায় খুবই কম, তার উপর খাওয়া কাজটি তার চক্ষের নিমেষে এমন চট্‌পট্ শেষ হয়ে যায় যে, একটু ঠাওর করে না দেখলে অনেক সময় বোঝাই যায় না। যতটুকু প্রাণী, জিভটি প্রায় ততখানি লম্বা ; সেই জিভটি তীরের মতো ছিট্‌কিয়ে পোকামাকড়ের উপরে পড়ে আর পরক্ষণেই টপ্ করে মুখের ভিতর ফিরে যায়। এর মধ্যে যে শিকার ধরা, শিকার মারা এবং খাওয়া, এই তিন কাজ শেষ হয়ে গেছে-সেটা বুঝতে অনেক সময় দেরি লাগে।

বহুরূপীর আর-একটি অদ্ভুত জিনিস তার চোখ দুটি। বড়ো-বড়ো চোখ দুটি এমনভাবে তৈরি যে একবার চোখ পাকালেই উপর নীচ ডাইনে বাঁয়ে ডাঙা এবং আকাশের প্রায় সব-খানিই বেশ দেখে নিতে পারে। তার উপর দুইটা চোখ একেবারে আলগাভাবে গাঁথা ; একটা যখন সামনের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে আছে, আর-একটা হয়তো ততক্ষণ চারিদিক ঘুরে ঘুরে ঘরবাড়ি গাছপালা সব তদ্‌বির করছে !

আর আছে বৃদ্ধ জরদ্গবের মতো এক জন্তু—আমেরিকার গেছো-গিরগিটি। গিরগিটি বললাম বটে কিন্তু গোসাপ বললেও চলত, কারণ এর এক-একটি নাকি প্রায় সাড়ে তিন হাত পর্যন্ত লম্বা হতে দেখা গিয়েছে। গলায় গলকম্বল, পিঠে সাংঘাতিক কাঁটা, তার উপর কোনো কোনোটার গায়ে মাথায় বড়ো-বড়ো আঁচিল, তাতে চেহারাটা কেমন কিম্ভূতকিমাকার হয় তা সহজেই কল্পনা করতে পার।

খাঁটি গোসাপ-জাতীয় জন্তু আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রায় সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। 'হিংস্র' বলতে যা বোঝায় গোসাপেরা ঠিক তা নয় কিন্তু একবার গোঁ ধরলে সেও ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে। আমাদের দেশে কথায় বলে 'কচ্ছপের কামড়', সাহেবেরা বলেন 'বুলডগের কামড়'—কিন্তু গোসাপ ক্ষেপলে পরে তার কামড় ছাড়ানোও বড়ো কম শক্ত নয়। হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে যে, গিরগিটিটাকে খুব বড়ো করতে পারলেই বুঝি ঠিক গোসাপ হয়ে দাঁড়াবে, কিন্তু বাস্তবিক গিরগিটি আর গোসাপের গড়নে কিছু তফাত আছে। গোসাপের ঘাড়টা অনেকটা লম্বা গোছের, আর তার জিভটা সাপের মতো চেরা, চলতে ফিরতে লক্‌লক্ করে। গোসাপেরা আমিষ-খোর, সাপ, টিকটিকি, ইঁদুর, ব্যাঙ, পাখি, এই-সব খেয়ে থাকে—তাদের বিশেষ প্রিয় খাদ্য নাকি কুমিরের ডিম। আমাদের দেশে গোসাপ ডাঙায়ও থাকে জলেও নামে, তাই সাঁতারের সুবিধার জন্য তাদের ল্যাজগুলি চ্যাটাল হয়। যে-সব গোসাপ কেবল শুকনো ডাঙায় বা গাছে থাকে, তাদের ল্যাজ হয় চাবুকের মতো গোল।

আরেকরকমের জন্তু রয়েছে যার গায়ে চক্র চক্র দাগ, সেটি হচ্ছে মেক্সিকোর 'বীভৎস গিলা' (gila monster) বা বিষধর গিরগিটি। ছোটো-ছোটো পা, তাতে শরীরটা মাটি থেকে আলগাই হয় না—তাকে সাপের মতো এঁকে বেঁকে মাটি ঘষে চলতে হয়। ছোট্টো দুটি চোখ, মুখভরা দাগের মধ্যে চট্ করে তাকে খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। দুম্বা ভেড়ার মতো ল্যাজটি চর্বিতে ভরা। যখন খাবার জোটে না, তখন ঐ ল্যাজটা শুকিয়ে আসে, ল্যাজের চর্বি সমস্ত শরীরে শুষে গিয়ে শরীরটাকে তাজা রাখে। কিন্তু আসল দেখবার জিনিসটা ওর মুখের মধ্যে। সেখানে যদি খোঁজ করো তবে দেখবে, ঠিক সাপের মতো তার বিষদাঁত রয়েছে। সে বিষে ছোটোখাটো জন্তু বা পাখি তো মরেই, মানুষ পর্যন্ত মারা গেছে বলে শোনা যায়।

একরকমের অদ্ভুত গিরগিটি আছে যে মনে হয় রাগে একেবারে ফুলে উঠেছে। তার গলায় যে রঙিন ছাতার মতো রয়েছে, সেটা অন্য সময়ে গুটিয়ে গলার চার দিকে পর্দার মতো ঝুলানো থাকে, কিন্তু ভয় বা রাগের সময় খাড়া হয়ে ছাতার মতো ছড়িয়ে পড়ে। তখন তার মুখের চেহারাটিও ভয়ানক হয়ে ওঠে। লাল ছাতার নীচে আগুনের মতো চোখ, তার উপর ঐরকম ধারালো দাঁত আর টকটকে জিভ—আর সেই সঙ্গে ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ করে লাফিয়ে ওঠা—এতে বাস্তবিক ভয় হবারই কথা। এই গিরগিটি দু পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে বেশ রীতিমতো ছুটতে পারে। ল্যাজসুদ্ধ এক-একটা প্রায় দু হাত পর্যন্ত লম্বা হয়। এই জন্তুর বাড়ি অস্ট্রেলিয়ায়।

মালয়দেশে এবং ফিলিপাইন দ্বীপে আর-এক-রকম গিরগিটি আছে, তাকে 'উড়ুক্কু গিরগিটি' বলা যেতে পারে। এদের পাঁজরের কয়েকখানা হাড় বুকের চামড়া ফুটো করে দু পাশে বেরিয়ে থাকে, সেগুলো পাতলা পর্দার মতো চামড়া দিয়ে ঢাকা। পর্দাটাকে পাখার মতো ছড়িয়ে এরা এক গাছ থেকে আর-এক গাছ পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে উড়ে যায়। ছোটোখাটো পোকা বা ফড়িং গাছের কাছ দিয়ে গেলে এরা চট্ করে তাদের উপর উড়ে পড়ে। এ ওড়া অবশ্য পাখির মতো ওড়া নয়, কারণ এরা রীতিমতো বাতাস ঠেলে উড়তে পারে না—লাফিয়ে বাতাসে ভর করে খানিকটা ভেসে যায় মাত্র। এরা থাকে বড়ো-বড়ো গাছের আগায়, কচিৎ কখনো নীচে নামে। এক গাছ থেকে আর-এক গাছে যেতে হলে এরা শূন্য দিয়েই যাতায়াত করে। এপর্যন্ত প্রায় কুড়িরকমের উড়ুক্কু গিরগিটি পাওয়া গিয়াছে—তাদের সবগুলোরই রঙ অতি চমৎকার—কোনো ফুল বা প্রজাপতির রঙও তার চাইতে সুন্দর বা উজ্জ্বল হয় না। সমস্ত গায়ে যেন রামধনুর নক্শা করা। এরাও কিন্তু বেশ রাগতে জানে, আর রাগলে পরে এদের গলাটি ফুলে তাতে নীল লাল নানারকম রঙের খেলা দেখা যায়।

এ ছাড়াও আরো কতরকমের গিরগিটি আছে, তাদের কথা বলবার আর জায়গা নেই। দাড়িওয়ালা গিরগিটি, শিংওয়ালা গিরগিটি, সাপের মতো গিরগিটি, মাছের মতো গিরগিটি, কত যে তাদের রকমারি তার আর অন্ত নেই। একটা আছে, তার কোন দিকটা ল্যাজ আর কোন দিকটা মাথা হঠাৎ দেখলে বোঝাই যায় না। আর-একটার হাত-পাগুলো লম্বা লম্বা কাঠির মতো। ল্যাজটা গোড়ায় সরু মাঝখানে মোটা আবার আগায় ছুঁচাল—ঠিক যেন কাঁচা লঙ্কাটি। এদের অনেকে আবার রঙ বদলাতে জানে—কেউ কেউ এ বিষয়ে বহুরূপীর চাইতেও ওস্তাদ। কেউ ডিম পাড়ে, কারও-বা একেবারে ছানা হয়। আবার কেউ-বা এমন ঠুন্‌কো যে, ধরামাত্র তার হাড়গোড় ভেঙে যায়।

সমুদ্রের ঘোড়া

সমুদ্রের ঘোড়া বলতে হঠাৎ যেন সিন্ধুঘোটক মনে করে বোসো না। সিন্ধুঘোটক থাকে সমুদ্রের ধারে, কিন্তু তাকে ঘোটক বলা হয় কেন তা জানি না। তার চাল-চলন চেহারা বা

শরীরের গড়ন, কিছুই ঘোড়ার মতো নয়—ঘোড়ার সঙ্গে তার খুব দূর সম্পর্কেও কোনো সম্বন্ধ পাওয়া যায় না—অথচ তাকে বলি 'সিন্ধুঘোটক'। হিপ্পোপটেমাসকে বাংলায় অনেক সময় 'জলহস্তী' লেখা হয়। তারও কিন্তু প্রকাণ্ড নাদুসনুদুস চেহারাটি ছাড়া হাতির সঙ্গে আর কোনোরকম মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং তাকে শুয়োরের সঙ্গে সমতুলনা করলে তার পরিচয়টা অনেকটা ঠিক হয়।

এখানে যাকে সমুদ্রের ঘোড়া বলছি, তাকে বর্মধারী মাছ বললেই তার ঠিক মতো পরিচয় দেওয়া হয়। কিন্তু তার অদ্ভুত ঘাড় বাঁকানো চেহারা আর খাড়া হয়ে চলাফেরা—এই দেখেই ইংরেজিতে তার নাম দেওয়া হয়েছে সমুদ্রের ঘোড়া (Sea Horse)। চেহারার বর্ণনা হিসাবে, নামটি যে চমৎকার হয়েছে তাতে আর সন্দেহ নেই। এই জন্তুর ল্যাজের দিকটা একেবারেই মাছের মতো নয়—তার উপর গায়ের চামড়াটিও চিংড়িমাছের খোলার মতো শক্ত। ল্যাজটি থাকাতে তার ভারি সুবিধা। যখন ইচ্ছা, জলের নীচে শ্যাওলা গাছে ল্যাজটি জড়িয়ে সে বেশ আরাম করে বিশ্রাম করে। যখন জলের নীচে মাথা উঁচিয়ে ল্যাজ নাড়িয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে এরা চলে ফিরে, তখন তেজী ঘোড়ার টগ্ বগ্ করে ছুটবার ধরনটাও মনে পড়ে। আসলে এরা যে 'নল' মাছের জাতভাই, সেটা এদের চোঙের মতো মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

নলমাছের চেহারাটা ঠিক তার নামেরই মতো। নলমাছের মুখখানা এমনভাবে তৈরি যে সে হাঁ করতে পারে না। ঐ চোঙার আগার একটু ফুটো আছে, তাই দিয়ে সে সুড়্ সুড়্ করে খাবার টেনে খায়। সমুদ্রের ঘোড়ার মুখখানিও ঠিক এই ধরনের।

এই অদ্ভুত জন্তুগুলির এক-একটা আবার ত্রিভঙ্গ ঘোড়ার মতো চেহারা করেও সন্তুষ্ট নয়। তারা নানারকম সাজ করে, রঙবেরঙের ঝালর ঝুলিয়ে কেমন কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি করে থাকে। ঝালরের সাজগুলা বাস্তবিক তার গায়ের চামড়া। ইংরাজিতে এদের বলে সমুদ্রের 'ড্রাগন' (Sea dragon) বা রাক্ষস। নামটি ভয়ংকর হলেও জন্তুটি ঠিক সমুদ্রের ঘোড়ার মতোই নিরীহ। তার ঐ রঙচঙে পোশাকের বাহারটা কেবল শত্রুর চোখে ধোঁকা দিবার জন্য। সমুদ্রের নীচে যে-সব অদ্ভুত রঙিন বাগান থাকে, তারই মধ্যে ফুল পাতার রঙের সঙ্গে রঙ মিশিয়ে এরা বেমালুম গা ঢাকা দিয়ে থাকে। নানারকম হিংস্র জন্তু আর মাছ সেখানে ঘোরে ফিরে। তারা এর চেহারা দেখে হঠাৎ বুঝতেই পারে না যে এটাও একটা জানোয়ার।

এদের আর-একটি বড়ো মজার অভ্যাস আছে—এরা সব সময় ছানার দল সঙ্গে নিয়ে ফেরে। ক্যাঙারুর পেটে যেমন থলি থাকে, তার মধ্যে ছোটো-ছোটো ছানাগুলা দরকার হলেই ঢুকে পড়ে—তেমনি ওদেরও কারও বুকে, কারও পেটে ছোটো-ছোটো থলির মতো থাকে। ছানারা ভয় পেলে ছুটে তার মধ্যে লুকোয়।

গরিলার লড়াই

যতরকম বনমানুষ আছে তার মধ্যে, বুদ্ধিতে না হোক, শরীরের বলে গরিলাই সেরা। হাত-পায়ের মাংসপেশীর বাঁধন থেকে তার দাঁড়াবার ধরন আর ভ্রূকুটিভঙ্গি পর্যন্ত সবই যেন খাঁ খাঁ করে তেড়ে বলছে, "খবরদার। কাছে এসো না।"

মানুষের মধ্যে এত বড়ো পালোয়ান কেউ নাই, যে এক মিনিটের জন্যেও একটা গরিলার রোখ সামলাতে পারে। কিন্তু গরিলায় গরিলায় যদি লড়াই লাগে, তা হলে সেটা দেখতে কেমন হয়? বড়ো-বড়ো পালোয়ান কুস্তিগীরের লড়াই দেখতে কত মানুষ পয়সা দিয়ে টিকিট কেনে; সে লড়াই যতই ভীষণ হয়, হুড়াহুড়ি ধস্তাধস্তি যতই বেশি হয়, মানুষের ততই উৎসাহ বাড়ে। কিন্তু গরিলাদের মধ্যেও কি সেরকম লড়াই বা রেষারেষি লাগে? লাগে বৈকি! এমন গরিলা পাওয়া গিয়েছে যার দাঁত ভাঙা বা কানটা ছেঁড়া, অথবা গায়ে মাথায় অন্য গরিলার দাঁতের চিহ্ন রয়েছে; লড়াইয়ের সময় কোনো মানুষ উপস্থিত থেকে তা দেখেছে, আজ পর্যন্ত এরকম শোনা যায় নি—কিন্তু মাঝে মাঝে এরকম লড়াই যে হয়, নানা-রকম গর্জন আর হুংকার আর বুক চাপড়াবার গুম্ গুম্ শব্দে অনেক সময় তার পরিচয় পাওয়া যায়। গরিলা যখন ক্ষ্যাপে, তখন রাগে সে খাড়া হয়ে দাঁড়ায় আর আপনার বুকে দমাদম্ কিল মারতে থাকে। তার চোখ দুটো তখন আগুনের মতো জ্বলজ্বল করে, তার কপালের লোম ফুলে ফুলে খাড়া হয়ে উঠে আর সেই সঙ্গে নাকের ফঁস্ ফঁস আর দাঁতের কড়্মড়্ শব্দ চলতে থাকে। তার উপর সে যখন হুংকার ছাড়ে, তখন অতি বড়ো সাহসী জন্তুও পালাবার পথ খুঁজতে চায়। লোকে বলে, সে হুংকার নাকি সিংহের ডাকের চাইতেও ভয়ানক।

মনে করো, জঙ্গলের মধ্যে কোনো গরিলাসুন্দরীর বিয়ের জন্য দুই মহাবীর পাত্র এসেছেন। দুজনেই তাকে ভালোবাসে, দুজনেই তাকে চায়, কেউ দাবি ছাড়তে রাজি নয়। এমন অবস্থায় পশুপাখির মধ্যে সর্বত্রই যা হয়ে থাকে, আর পুরাণের বড়ো-বড়ো স্বয়ংবর সভাতেও যেমন হয়ে এসেছে, এখানেও ঠিক তাই হওয়াই স্বাভাবিক। তখন দুই বীর আপন আপন তেজ দেখিয়ে লড়াই করতে লেগে যায়। সে ভীষণ লড়াই যে একটা দেখবার মতো ব্যাপার তাতে আর সন্দেহ কি? গরিলার চড় আর গরিলার ঘুঁষি, যার একটি মারলে মানুষের ভুঁড়ি ফেঁসে যায়, মাথার খুলি দু' ফাঁক হয়ে যায়, সে কেবল গরিলার গায়েই সয়। সেই চট্‌পট্ দুম্‌দুম্ কিল চড়ের সঙ্গে খাম্‌চা-খাম্‌চি আর কাম্‌ড়া-কাম্‌ড়িও নিশ্চয়ই চলে। এইরকমে যতক্ষণ না লড়াইয়ের মীমাংসা হয়, অর্থাৎ যতক্ষণ একপক্ষ হার মেনে চম্পট না দেয়, ততক্ষণ হয়তো গরিলাসুন্দরীর চোখের সামনেই এক ভীষণ কাণ্ড চলতে থাকে। সে বেচারা হয়তো চুপ করে তামাশা দেখে, কিম্বা দুজনের মধ্যে কাউকে যদি তার বেশি পছন্দ হয়, তবে তার পক্ষ হয়ে লড়াইয়ে একটু-আধটু যোগ দেওয়াও তার কিছু আশ্চর্য নয়।

বর্মধারী জীব

কচ্ছপ কুমির আর সজারু, এই তিন বর্মধারী জন্তুকে বোধ হয় তোমরা সকলেই দেখেছ। এদের তিনজনের বর্ম তিনরকমের। কচ্ছপের খোলাটা যেন তার জ্যান্ত বাসা— তার মধ্যে মুখ হাত পা গুটিয়ে যখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে তখন দুর্গের মতো বর্মটাকেই দেখতে পাই—বর্মধারী যিনি, তাঁকে আর খুঁজেই পাওয়া যায় না। কুমিরের বর্মটা যথার্থই বর্ম, অন্য জন্তুর নখ দাঁতের অস্ত্র থেকে কেবল শরীরটাকে বাঁচানোই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু সজারুর বর্ম কেবল বর্ম নয়, সেটা একটা সাংঘাতিক অস্ত্রও বটে।

কচ্ছপ আর কুমিরের কথা তোমরা অনেক শুনেছ, কিন্তু তাদের আশ্চর্য বয়সের কথা অনেকেই জানে না। হাতির বয়সের কথা শুনতে পাই, তারা নাকি অনেক বৎসর বাঁচে। কিন্তু এই দুই জন্তু দুশো-আড়াইশো বৎসর যে বাঁচে তাতে কোনো সন্দেহই নেই, চার-পাঁচশো বৎসর পর্যন্ত তাদের বয়স হয়—এ কথা প্রাণিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরাও বিশ্বাস করে থাকেন। এক ধরনের কচ্ছপকে বলে Giant Tortoise অর্থাৎ রাক্ষুসে কচ্ছপ। এরা এক-একটি তিন হাত, সাড়ে তিন হাত পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। আগে পৃথিবীর নানা জায়গায় এরকমের কচ্ছপ পাওয়া যেত, কিন্তু পেটুক মানুষের অত্যাচারে তাদের বংশ এমনভাবে লোপ পেয়ে এসেছে যে, এখন দু-একটি সমুদ্রের দ্বীপ ছাড়া এদের আর কোথাও খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। ১৭৬৬ খৃস্টাব্দ থেকে এইরকম আর-একটি রাক্ষুসে কচ্ছপকে মরিশাস্ দ্বীপে রাখা হয়েছে। সেই সময়ে তার বয়স যে খুব কম হলেও পঞ্চাশ বৎসর ছিল, তাতে আর সন্দেহ নাই— সুতরাং এখন তার দুশো বৎসর পার হয়ে গেছে। লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় একটা থুড়থুড়ে বুড়ো কচ্ছপ কয়েক বৎসর হল মারা গিয়েছে—তার বয়স আরো অনেক বেশি হয়েছিল— কেউ কেউ বলেন চারশো বৎসরেরও বেশি। কুমিরও অনেকদিন বাঁচে—বয়স নিয়ে কচ্ছপের সঙ্গে তার রেষারেষি হলে কে হারে কে জেতে সে কথা বলা শক্ত।

কুমিরের বর্মটি কতকগুলি চামড়ার চাক্‌তি মাত্র। চামড়ার মধ্যে মোটা-মোটা কড়া জমিয়ে বর্মটি তৈরি হয়েছে। কিন্তু কচ্ছপের খোলাটি শুধু চামড়া নয়—মেরুদণ্ডের সঙ্গে পাঁজরের হাড় আর গায়ের চামড়া একসঙ্গে জুবড়িয়ে তাকে শিঙের মতো মজবুত করে বর্মের এই অদ্ভুত সৃষ্টি হয়েছে। আর সজারুর বর্মটি তৈরি হয়েছে তার লোম দিয়ে। লোমের গুচ্ছ মোটা আর মজবুত আর ধারালো হয়ে সাংঘাতিক কাঁটার বর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সজারুরা নিশাচর জন্তু। মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে তারা সারাদিন ঘুমিয়ে থাকে আর রাত্তিরে বেরিয়ে ফল-মূল গাছের পাতা খেয়ে বেড়ায়। গর্তের মধ্যে নরম ঘাস আর কচি পাতা দিয়ে তারা বাসা বানায়। সজারুর যখন ছানা হয় তখন ছানার কাঁটাগুলো থাকে ঘাসের মতো নরম, কিন্তু খুব অল্পদিনের মধ্যেই সেগুলো বেশ শক্ত হয়ে ওঠে। সজারুর ল্যাজটা যেন একটা কাঁটার তোড়া, চলবার সময় তাতে খড়্‌খড়্ করে শব্দ হতে থাকে।

কোনো কোনো সজারু খুব চট্‌পট্‌ গাছে চড়তে পারে, তাদের ল্যাজ প্রায়ই খুব লম্বা হয়। আবার কোনো কোনোটার কাঁটা বড়ো-বড়ো লোমে ঢাকা।

কাঁটাওয়ালা জন্তু আরো অনেক আছে, কিন্তু সজারুর মতো এমন কাঁটার বাহার আর কারও নেই। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার একিড্‌না (Echidna) জন্তুটির একটুখানি চেহারা দেখলেই বুঝতে পারবে যে, এমন অদ্ভুত জানোয়ার সম্বন্ধে দু-একটা কথা না বললে নিতান্তই অন্যায় হবে। সাধারণ একিড্‌নাগুলি বেড়ালের চাইতে বড়ো হয় না ; কিন্তু 'ধাড়ি একিড্‌না' বা Proechidna আরো অনেকখানি বড়ো হয়—বেশ একটি ছোটোখাটো ভাল্লুকের মতো। অস্ট্রেলিয়ার প্লেটিপাস (Platypus) বা হংসচঞ্চুর মতো এরাও স্তন্যপায়ী অথচ ডিম পাড়ে—ডিম ফুটে যে ছানা বেরোয় তারা মায়ের দুধ খায়। এই জন্তুর শরীরটি ছোটো-ছোটো কাঁটায় ভরা—ছোটো-ছোটো কিন্তু খুব শক্ত আর ধারালো-মুখখানা ওরকম অদ্ভুত ছুঁচালো হবার কারণ এই যে, এরা পিঁপড়ে-খোর। চোঙার মতো মুখ, তার মধ্যে একটিও দাঁত নাই —আছে খালি একটি প্রকাণ্ড সরু লম্বা জিভ—তাই দিয়ে সে লক্‌লক্‌ করে পিঁপড়ে চেটে খায়। সজারুর মতো এরাও নিশাচর—তাই দিনের বেলায় গর্ত খুঁড়ে লুকিয়ে থাকে।

পিঁপড়ে-খোর জন্তুদের অনেকেরই মুখ ঐ চোঙার মতো কিন্তু সকলের গায়ে বর্ম নাই। যাদের গায়ে বর্ম আছে তাদের নাম প্যাঙ্গোলিন (Pangolin)। এই জন্তুর বর্মের গড়ন ভারি অদ্ভুত ; শিঙের মতো মজবুত চাকতি, সমস্তটি গায়ের উপর মাছের আঁশের মতো সাজানো। পায়ের নখগুলি সাংঘাতিক মজবুত—তাই দিয়ে আঁচড়িয়ে তারা উইয়ের ঢিপি আর পিঁপড়ের বাসা ভেঙে ফাঁক করে ফেলে। তার পর জিভ দিয়ে টপাটপ্‌ উই পিঁপড়ে চেটে খায়। হঠাৎ তাড়া করলে বা ভয় পেলে এরা ডিগবাজি খেয়ে ফুটবলের মতো গোল পাকিয়ে যায়। এদের গায়ের ধারালো আঁশগুলি তখন চারিদিকে খাড়া হয়ে ওঠে। দক্ষিণ আমেরিকার আর্‌মাডিলো এ বিষয়ে আরো ওস্তাদ। সে যখন হাত-পা গুটিয়ে শরীরটিকে লাড়ু পাকিয়ে ফেলে তখন কোথায় মুখ কোথায় হাত-পা, কিছুই বুঝবার জো থাকে না। তার বর্মের গড়নটি মাছের আঁশের মতো নয়—চিংড়ি মাছের খোলার মতো।

বর্মধারী জীবের কথা বলতে গেলে আরো অনেক জন্তুরই নাম করতে হয়। শামুক ঝিনুক প্রবাল হতে আরম্ভ করে কাঁকড়া চিংড়ি বিচ্ছু, এমন-কি, মাছ গিরগিটি পর্যন্ত প্রাণের দায়ে কত দেশে কতরকম বর্ম এঁটে ফেরে তার আর সীমা সংখ্যা নাই। হাজাররকম জীবজন্তু, তারা সবাই যখন বাঁচতে চায় তখন বাঁচবার উপায়ও তাদের করতে হয়। বাঁচবার উপায় তিনরকম। এক হচ্ছে গায়ের জোরে অস্ত্রেশস্ত্রে প্রবল হয়ে শত্রুকে মেরে বাঁচা ; আর-এক হচ্ছে দৌড়ের জোরে বা কলা-কৌশলে পালিয়ে আর লুকিয়ে বাঁচা ; আর তৃতীয়টি হচ্ছে শরীরটিকে এমন জবরদস্ত করা যে, মারধোর অত্যাচারের চোট সে সয়ে থাকতে পারে। বর্মধারী জীবেরা এই শেষ উপায়টিকে বাগাবার চেষ্টায় আছেন। এতে এক-একজন যে অনেকখানি ওস্তাদি দেখিয়েছেন তাতে সন্দেহ কি ?

ধনঞ্জয়

এ পাখির ইংরাজি নাম হর্নবিল্ (Hornbill) অর্থাৎ শৃঙ্গচঞ্চু, কিন্তু তার আসল বাংলা নামটি যে কি, তা আর খুঁজে পেলাম না। লোকে তাকে ধনঞ্জয় বা ধনেশ পাখি বলে, কিন্তু অভিধান খুঁজতে গিয়ে দেখি, ও নামে কোনো পাখিই নেই। ওর কাছাকাছি একটা আছে, তার নাম ধনচ্চু—'হাড়গিলার আকার-বিশিষ্ট পক্ষীবিশেষ, করেটু পক্ষী'। 'করেটু' মানে 'কর্করেটু পক্ষী'—'কর্করেটু' মানে 'করাটিয়া পক্ষী'। আবার 'করাটিয়া'র মানে দেখতে গেলে আরো কত নাম বেরুতে পারে, সেই ভয়ে আর দেখা হল না। যাহোক নাম দিয়ে কেউ যদি চিনতে না পারে, তবে চেহারাটা দেখলে তার পরিচয় পেতে বোধ হয় দেরি হবে না—কারণ, এ চেহারা একবার দেখলে আর সহজে ভুলবার জো নেই।



আলিপুরের চিড়িয়াখানায় যত অদ্ভুত পাখি আছে, তার মধ্যে 'ফার্স্ট প্রাইজ' কাউকে দিতে হলে বোধ হয় একেই দেওয়া উচিত। আমরা ছেলেবেলায় যখন এই পাখিকে প্রথম দেখি তখন তার নাম দিয়েছিলাম 'দুই-ঠোঁটওয়ালা পাখি'। বাস্তবিক কিন্তু এর একটামাত্রই

ঠোঁট। উপরেরটা শিং বলতে পার—সেটার সঙ্গে তার মুখ বা ঠোঁটের কোনো সম্পর্কই নেই। অত বড়ো একটা জমকাল শিং দিয়ে তার কি যে কাজ হয়, তা তো দেখতে পাই না। অত্যন্ত নিরীহ পাখি, কারও সঙ্গে গুঁতাগুঁতি করবার সাহস তার আছে কিনা সন্দেহ। চেহারা দেখলে মনে হয়—'বাপ্ রে! এই ঠোঁটের একটি ঠোকর খেলেই তো গেছি'। কিন্তু নিতান্ত ঠেকা না পড়লে গুঁতা মারার অভ্যাসটিও তার নেই বললেই হয়।

এত বড়ো ঠোঁট তার উপর এমনধারা শিং, এই বিষম বোঝা বয়ে বয়ে পাখিটার মাথাও কি ধরে না? চলতে ফিরতে উড়তে গিয়ে সে কি উলটেও পড়ে না? আসল কথা কি জান? তার ঠোঁটটি আর শিংটি আগাগোড়াই ফাঁপা, কাঁকড়ার খোলার মতো হালকা। তাই তার ঠোঁট নিয়ে বড়ো-বড়ো গাছের আগডালের উপরে সে লাফিয়ে বেড়ায়—খাবার দেখলে ঝুপ্ করে উড়ে এসে পড়ে। কেবল তাই নয়, তার দিকে খাবারের টুকরো ছুঁড়ে দেখ দেখি, সে কেমন চট্‌পট্ ঘাড় ফিরিয়ে তার বিশাল ঠোঁটের মধ্যে খাবার লুফে নেবে। এ বিষয়ে তার মতো ওস্তাদ আর বোধ হয় দ্বিতীয় নেই; আর এমন খানেওয়ালাও বোধ হয় আর একটি পাওয়া দুষ্কর!

এক সাহেবের এক পোষা ধনঞ্জয় ছিল—সে আমাদের দেশে নয়, বোর্নিও দ্বীপে। সে-দেশে এই পাখি অনেকেই পুষে থাকে। সাহেব বলেন, এমন সর্বনেশে পেটুক জীব আর কোথাও মেলে না। সেই এতটুকু বাচ্চা বয়স থেকেই তাকে খাইয়ে খাইয়েও মানুষে ঠান্ডা রাখতে পারত না। এইমাত্র খাইয়ে গেলে, আবার পাঁচ মিনিট পরেই দেখবে হতভাগা ল্যাজের উপর ভর দিয়ে পা মুড়ে বসে বসে প্রকাণ্ড হাঁ করে ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দে বিকট কান্না লাগিয়েছে। তার পর একটু বয়স হলে তখন তার অত্যাচারে বাড়িতে টেঁকা দায় হয়ে উঠল। খাবার সময় তার ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে তাকে আটকে রাখতে হত, তা নইলে সে পাতের খাবারে, ভাতের হাঁড়িতে, ব্যঞ্জনের বাটিতে, দুধের কড়ায়, যেখানে সেখানে মুখ দিয়ে সকলকে অস্থির করে তুলত। মাছমাংস, ডালভাত, রুটিবিস্‌কুট, ময়দার ডেলা, যা দাও তাতেই সে খুশি, কিন্তু পেট ভরে দেওয়া চাই। পেটটি ভরলেই সে উড়ে গিয়ে গাছের আগায় বিশ্রাম করবে, রোদ পোহাবে আর প্রাণপণে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নূতন করে সাংঘাতিক খিদে ডেকে আনবে।

ধনঞ্জয় পাখির চাল-চলন স্বভাব যাঁরা লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা বলেন, এই পাখির বাসা বাঁধবার ধরনটি তার চেহারার চাইতে কম অদ্ভুত নয়। যখন ছানা হবার সময় হয় তখন মা-পাখিটা একটা গাছের কোটরের মধ্যে আশ্রয় নেয়, আর বাবা পাখি সেই কোটরের মুখটাকে কাদামাটি শ্যাওলা দিয়ে বেশ করে এঁটে বন্ধ করে দেয়—কেবল একটুখানি ফোকর রাখে, তা না হলে বাইরে থেকে খাবার দেবে কি করে? সেই কোটরের মধ্যে ডিম পেড়ে মা-পাখি দিনের পর দিন তার উপর বসে বসে তা দেয়। আর বাবা-পাখি বাইরে থেকে পাহারা দেয়, আর ফোকরের ভিতর দিয়ে সারাদিন খাবার চালান করে। এমনি করে যখন ডিম ফুটে ছানা বেরোয়, আর সেই ছানাগুলো যখন একটু বড়ো হয়, তখন বাসা ভেঙে মা-পাখি বেরিয়ে আসে। এতদিন বন্ধ জায়গায় বসে বসে তার পা এমন আড়ষ্ট হয়ে যায় যে কোটর থেকে বেরোবার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে উড়তে পারে না, ভালো করে চলতে ফিরতেও

পারে না। এই বাসা গড়া ও ভাঙার সময় ধনঞ্জয়ের লম্বা ঠোঁট আর শিং এ দুটোই বোধ হয়ে বেশ কাজে লাগে।

ধনঞ্জয় পাখি আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়ার নানা জায়গায় বাস করে এবং তার নানা-রকম চেহারা দেখা যায়। উড়িষ্যা দেশে এ পাখির নাম 'কুচিলাখাই'। 'কুচিলাখাই'য়ের গায়ের রঙ কালো, তার উপর ঠোঁট আর শিঙের চক্‌চকে লালচে হলুদ দেখতে বেশ মানায়। নেপালের লাল ধনঞ্জয়ের শিং নেই বললেই হয়, কিন্তু তার মুখে মাথায় খুব গম্ভীরগোছের কেশর আছে আর ঠোঁট দুটো করাতের মতো দাঁতালো। সুমাত্রা দ্বীপের ধনঞ্জয়ের শিং একেবারেই নেই, কিন্তু তার জমকাল কেশরটি অতি চমৎকার ধবধবে সাদা। আবার কেউ কেউ আছেন যাঁদের শিংও আছে, কেশরও আছে। শিঙের রকমারিও অনেক দেখা যায়—কারও শিং খড়্গের মতো বাঁকা, কারও কিরিচের মতো সোজা, আবার একজন আছেন তাঁর শিংটি শশার মতো গোল, তার উপরে ঝুঁটি।

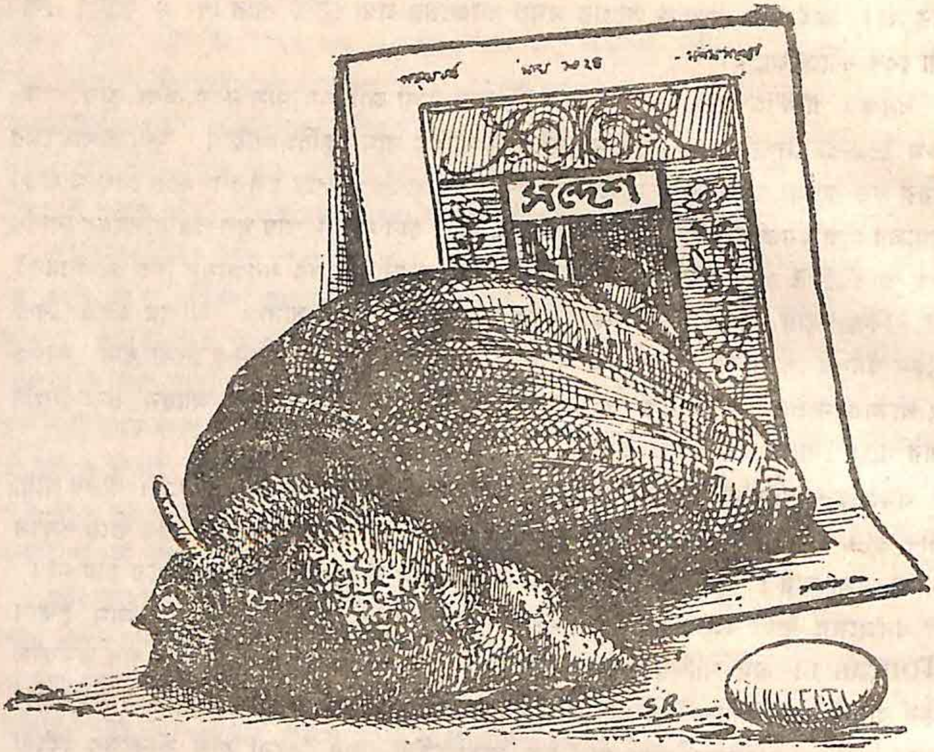
ধনঞ্জয়ের চেহারাটি যেমন বিকট তার গলার আওয়াজটিও তেমনি কট্‌কটে। বনের মধ্যে হঠাৎ তার গলা শুনলে অন্য পাখিরা তো ভয় পায়ই, বাঁদর বা বনবেড়াল পর্যন্ত ভয়ে পালায় এমনও দেখা যায়। তা ছাড়া তার মাংস নাকি এমন বিস্বাদ যে কুকুরেও খেতে চায় না।

ধনঞ্জয়ের কথা বলতে গেলে আর-এক পাখির কথা বলতে হয়—তার নাম টুকান (Toucan)। এই পাখির বাসা আমেরিকায়। এদের গায়ে অনেক সময়ে খুব জমকাল রঙের বাহার দেখা যায়—কিন্তু আসল দেখবার জিনিস এদের সাংঘাতিক লম্বা ঠোঁট দুখানি। দেখলে মনে হয় যত বড়ো পাখি প্রায় তত বড়ো ঠোঁট—যেন 'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি'। তাতে চেহারাটি কেমন খোলে, তার আর বেশি বর্ণনা করবার দরকার নেই। দেখতে অনেকটা ধনজয়ের মতো হলেও আসলে এরা ধনঞ্জয় নয়—আর ধনঞ্জয়ের মতো অত বড়োও হয় না।

শামুক ঝিনুক

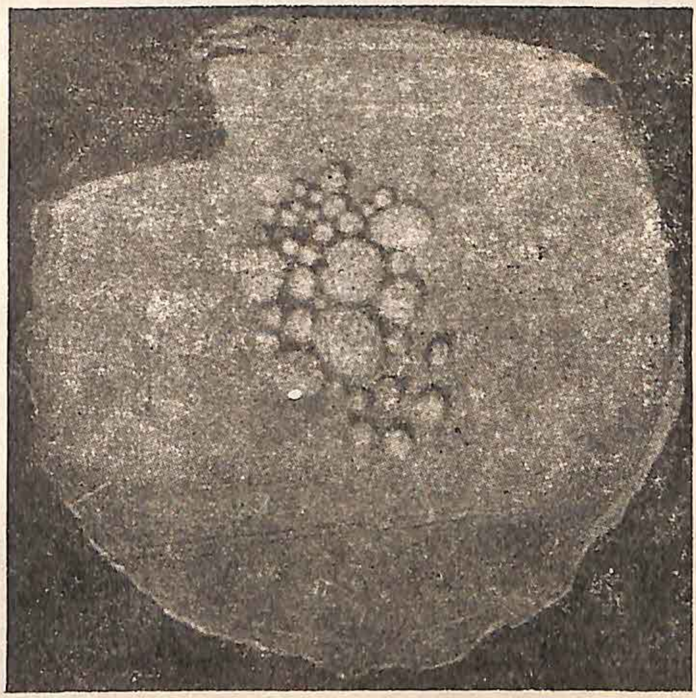
আমাদের শরীরের ভিতরকার শক্ত কাঠামোটিকে আমরা কংকাল বলি। কংকালটা ভিতরে থাকে আর এই রক্ত মাংসের শরীর তাহাকে ঢাকিয়া রাখে—এইরূপই আমরা সচরাচর দেখি। কিন্তু এমন জীবও আছে যাহার কংকালটা থাকে শরীরের বাহিরে। এমন অদ্ভুত কাণ্ড কেহ দেখিয়াছ কি? বোধ হয় সকলেই দেখিয়াছ। কারণ, আমি কোনো অসাধারণ বিদ্‌ঘুটে জন্তুর কথা বলিতেছি না—এই নিতান্ত সাধারণ শামুক ঝিনুক প্রভৃতির কথাই বলিতেছি।

শামুক ঝিনুকের মতো নিতান্ত সামান্য জিনিসের মধ্যে যে কত আশ্চর্য ব্যাপার লুকানো থাকে, ভাবিলে অবাক হইতে হয়। তোমরা গেঁড়ি দেখিয়াছ? বাগানে পুকুরের কাছে স্যাঁৎসেঁতে জায়গায় ছোটো-ছোটো জীবন্ত শামুকগুলি যারপরনাই অলসভাবে আস্তে-আস্তে চলাফিরা করে—তাহাদের নাম গেঁড়ি। ঝিনুকের মধ্যে যে, জীবন্ত প্রাণীটি বাস করে, তাহার



চালচলনটিও কম অদ্ভুত নয়। তাহাদের অনেকেই সারা জন্ম মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে। কেহ কেহ এমন গোঁয়ার, তাহারা ক্রমাগত পাথর ফুঁড়িয়া তাহার ভিতর ঢুকিতে চায়। দুই-একজন আছে তাহারা লাফানো বিদ্যাটি বেশ অভ্যাস করিয়াছে, কথা নাই বার্তা নাই হঠাৎ তড়াক করিয়া এক-একটা লাফ দেয়। আর সমুদ্রের নীচে শুক্তিগুলো যে আপনাদের খোলার ভিতরে ছোটো-বড়ো নানারকম মুক্তা জমাইয়া রাখে, তাহার কথাও তোমরা নিশ্চয়ই জান। একরকম পোকার জ্বালায় অস্থির হইয়া ঝিনুকের গায়ে রস গড়ায় আর সেই রস জমিয়া মুক্তা হয়।

শামুক বা ঝিনুকের যখন জন্ম হয় তখন তাহাদের খোলাটি থাকে না, তাহার জায়গায় একটা পুরু চামড়ার মতো থাকে ; সেই চামড়াটি শক্ত হইয়া ক্রমে মজবুত খোলা তৈরি হয়। যে ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয়, সেই ডিগগুলি দেখিতে বড়োই অদ্ভুত। কতগুলি ছোটো-ছোটো পোঁটলা একসঙ্গে মালার মতো বাঁধা থাকে। প্রত্যেকটি পোঁটলার মধ্যে কতগুলি ডিম। এক-একটি শামুক অনেকগুলি ডিম পাড়ে—একশো-দেড়শো হইতে দশ-বিশহাজার। কিন্তু এ-বিষয়ে এক-একটা ঝিনুকের ওস্তাদি অনেক বেশি। সমুদ্র বা নদীর জলে এমন সব ঝিনুক দেখা যায় যাহারা একেবারে দশ-বিশলাখ ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিয়া যখন ছানা বাহির হয়, তখন তাহাদের খাইবার জন্য নানারকম জীবজন্তু চারিদিক হইতে ঘিরিয়া আসে, কারণ খোলা জন্মিবার আগে এই নরম অবস্থাতেই এগুলিকে খাইবার সুবিধা। বাস্তবিক, অল্প বয়সেই ইহারা যদি এরূপভাবে উজাড় না হইত, তবে শামুক ঝিনুকের অত্যাচারে



পৃথিবীতে বাস করাই দায় হইত। যে প্রাণী এক-একবারে হাজার হাজার জন্মিতেছে তাহাদের প্রত্যেকটি যদি বড়ো হইতে পায়, আর প্রত্যেকের হাজার হাজার করিয়া ছানা হয়, আর এইরকম বছরের পর বছর চলিতে থাকে, তবে অবস্থাটা নিতান্তই সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায় বৈকি। এরূপভাবে বাড়িতে পারিলে একটিমাত্র শামুকের বংশধরেরা পাঁচ-সাত বৎসরের মধ্যে সমস্ত কলিকাতা শহরটিকে একেবারে বেমালুম ঢাকিয়া দিতে পারিত।

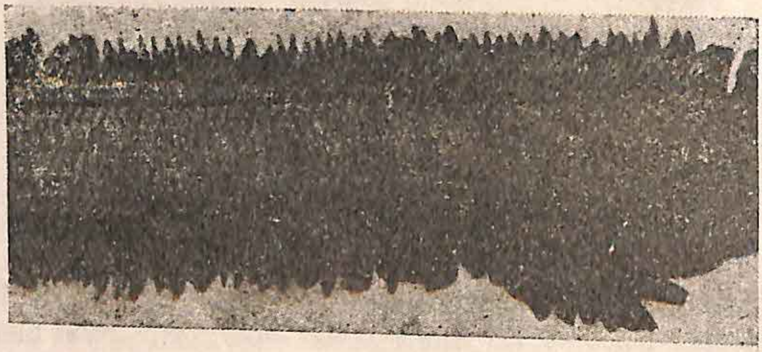
বলিতে গেলে একসময় এই পৃথিবীতে ইহাদেরই রাজত্ব ছিল। সেকালের হিসাবেও ইহা খুবই পুরাতন সময়ের কথা। তখন আর কোনো জীবজন্তু ছিল না কেবল নানারকম শঙ্খ আর অদ্ভুত জলজন্তুরা এই দুনিয়ার পরিচয় লইয়া ফিরিত। আজও তাহাদের কংকাল জমিয়া কত মাটির নীচে কত সমুদ্রের বুকে বড়ো-বড়ো স্তর বাঁধিয়া আছে।

গেঁড়ির কথা বলিতে গেলে সবচাইতে বড়ো যে আফ্রিকার রাক্ষুসে গেঁড়ি তাহার কথাও বলা উচিত। সেগুলি কতখানি বড়ো তাহা পুরাপুরি দেখাইতে গেলে বই-এর পৃষ্ঠায় কুলাইবে না। ইহারা একটি করিয়া লম্বাগোছের ডিম পাড়ে—ঠিক পাখির ডিমের মতো শক্ত আর সাদা।

কিন্তু সমুদ্রের শঙ্খজাতীয় জন্তুদের মধ্যে ইহার চাইতে অনেক বড়ো জীবও বিস্তর দেখা যায়। তাহাদের এক-একটির খোলা এমন প্রকাণ্ড হয় যে, একটি ছোটোখাটো ছেলেকে তাহার মধ্যে অনায়াসে শোয়াইয়া রাখা যায়।

শামুকেরা খায় কি? নরম ঘাস, কচি পাতা, জলের পানা—এইগুলি অনেকেরই প্রধান খাদ্য। আবার কেহ কেহ আছেন, তাঁহাদের নিরামিষে রুচি নাই, তাঁহারা নানারকম পোকা-

মাকড়, জলের কীট এই-সকল খাইয়া থাকেন। ঝিনুকেরও খাওয়া এইরকমই, তবে তাহারা এক জায়গায় পড়িয়া থাকে বলিয়া তাহাদের আহার জুটিবার সুযোগ কিছু কম। ঝিনুকের খোলায় দুটি করিয়া পাট থাকে, সে দুটিকে তাহারা ইচ্ছামতো কব্জা ঘুরাইয়া খুলিতে ও জুড়িয়া দিতে পারে। খাবারের দরকার হইলে তাহারা সেই দরজা ফাঁক করিয়া রাখে; চলিতে চলিতে অথবা স্রোতে ভাসিয়া যে-সকল কীট সেই হাঁ-করা মুখের মধ্যে আসিয়া পড়ে তাহাদের সে চট্‌পট্‌ খাইয়া ফেলে। শামুক আর ঝিনুকের খাওয়ার মধ্যে আর-একটি তফাত এই যে, ঝিনুকের দাঁত নাই, কিন্তু শামুকের দাঁত আছে। দাঁত বলিতে মানুষের দাঁতের মতো কিছু একটা মনে করিও না। এই দাঁতগুলি তাহাদের জিভের গায়ে অতি সূক্ষ্মভাবে সাজানো থাকে, এক-একটা শামুকের প্রায় দুই-চারশো বা হাজার-দেড় হাজার দাঁত। অণুবীক্ষণ দিয়া সেই দাঁতাল জিভটিকে কেমন দেখা যায় তাহার একটা নমুনা দেওয়া গেল। উখার মতো



ধারালো এই জিভটিকে সে তাহার খাবারের ভিতরে, উপরে, আশেপাশে ঘ্যাশ্‌ ঘ্যাশ্‌ করিয়া চালাইতে থাকে। তাহাতেই খাবার জিনিস সব টুকরা টুকরা হইয়া থ্যাৎলাইয়া কাদার মতো নরম হইয়া যায়। ছবিতে যেমন দেখানো হইল, সকলের জিভ ঠিক এইরকম নয় এক-একটার জিভের আগা পর্যন্ত সাংঘাতিক ধারালো; সেই জিভ দিয়া তাহারা অন্য জন্তুর গায়ে ফুটা করিয়া দেয়, নিরীহ ঝিনুকগুলির খোলা ফুঁড়িয়া তাহাদের চুষিয়া খায়।

তার পর শামুক ঝিনুকের চেহারার বাহার যদি বর্ণনা করিতে বসি, তবে তো শেষ করাই মুশকিল হইবে। কত হাজাররকমের শঙ্খ, তাদের কতরকম আকার, কতরকম রঙ। তার এক-একটার যে কি আশ্চর্য সুন্দর গড়ন শুধু কথায় তাহা আর কত বোঝানো যায়।

মাছি

আমার সামনে টেবিলের উপর এক টুকরা চিনি পড়িয়াছিল। একটা মাছি খুব মন দিয়া সেইটাকে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। চিনির কাছে মুখ রাখিয়া সে অনেকক্ষণ

স্থির হইয়া আছে, মনে হয় সে একটা ভারি ভাবনায় পড়িয়া হঠাৎ যেন গম্ভীর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু একটু ভালো করিয়া দেখিলে বোঝা যায় যে সে এখন আহারে ব্যস্ত। তাহার মুখের তলায় শুঁড়ের মতো কি একটা জিনিস বার বার ওঠানামা করিতেছে। একবার চকিতে চিনির উপর ঠেকিয়া আবার মুহর্তের মধ্যে কোথায় ঢুকিয়া যাইতেছে। কাজটা এত চট্ পট্ তাড়াতাড়ি চলিতেছে যে ভালো করিয়া না দেখিলে চোখে ধরাই পড়ে না।

ভাবিলাম এই বেলা মাছিটাকে ধরিয়া ফেলি। কিন্তু মাছিটা আমার চাইতেও অনেকখানি চট্ পটে, আমার হাত একটু নড়িতেই সে ব্যস্ত হইয়া উড়িয়া গেল। বাস্তবিক, মাছির চোখ এড়ানো খুবই শক্ত। ঐ যে তাহার লালমতো মাথাটি দেখিতে পাও ঐ সমস্ত মাথাটি তাহার চোখ। একটি নয়, দুটি নয়, হাজার-হাজার চোখ। অণুবীক্ষণ দিয়া বেশ বড়ো করিয়া দেখিলে মনে হয়, মাথাটি যেন অতি সূক্ষ্ম জাল দিয়া মোড়া। আরো বড়ো করিয়া দেখিলে দেখা যায় সেই জালের প্রত্যেকটি ফোকর এক-একটি আস্ত চোখ। প্রত্যেকটি চোখের ভিতর এক-একটি পর্দা—প্রত্যেকটি পর্দার উপর বাহিরের জিনিসের এক-একটি অতি ক্ষুদ্র ছায়া পড়ে। এইরকম হাজার-হাজার চক্ষু মেলিয়া না জানি সে জগৎটাকে কিরকম দেখে।

অণুবীক্ষণ দিয়া মাছিকে পরীক্ষা করিয়া দেখ, যেখানে দেখিবে সেখানেই সূক্ষ্ম কৌশলের অদ্ভুত কাণ্ড। ঐ যে শুঁড়ের মতো তাহার জিভটি, সেও একটা কম আশ্চর্য ব্যাপার নয়। পাখার মতো ছড়ানো জিনিসটি তাহার জিভের আগা। শিরার মতো জিনিসগুলির প্রত্যেকটি এক-একটি নল। সেই নল দিয়া সে খাবার জিনিস চুষিয়া খায়। নলগুলি সমস্তে মিলিয়া গোড়ার দিকে মোটা চোঙার মতো হইয়াছে, সেই চোঙার ভিতর দিয়া খাবার জিনিস তাহার মুখের মধ্যে ঢুকিতে পায়। যদি আরো সূক্ষ্মভাবে খুব ভালো অণুবীক্ষণ দিয়া দেখো, দেখিবে প্রত্যেকটি নলের মধ্যে আবার আরো কত সূক্ষ্ম কারিকুরি। এক-একটি নল যেন অসংখ্য আংটির মালা—আংটির উপর আংটি বসানো, তাহাতে অসম্ভবরকম পাতলা চামড়ার ছাউনি। ঐ নলগুলার গায়ে দুপাশে দুইটি কালো দাঁড়ার মতো দেখিতেছ, ঐ দুইটি গুটাইলে সমস্ত জিভটা ছাতার মতো গুটাইয়া যায়। জিভটা যখন মুখের ভিতর থাকে তখন তাহাকে এমনিভাবে গুটাইয়া মুড়িয়া রাখিতে হয়, আবার আহারের সময় দাঁড়া দুটি নাড়া দিলেই নলগুলি মুহূর্তের মধ্যে ছড়াইয়া ঝাড়ের মতো ঝুলিয়া বাহির হয়। গোরু বা ঘোড়ার গায়ে একরকম বড়ো মাছি বসে, তাহাদের ডাঁশ বলে। ডাঁশেরা রক্তপায়ী, সুতরাং তাহাদের জিভের সঙ্গে একজোড়া করিয়া হুল থাকে। জিভটাও মাছির জিভের চাইতে অনেকখানি সরু—দেখিতে কতকটা বোতলের মতো। হুলের খোঁচায় জন্তুর গায়ে ফুটা করিয়া সেই ফুটার মধ্যে ইহারা জিভের আগাটুকু ঢুকাইয়া রক্তপান করে।

তার পর দেখ মাছির চরণখানি! ইহার মধ্যেও দেখিবার মতো জিনিস অনেক আছে। প্রথমেই চোখে পড়ে অদ্ভুত শিঙের মতো জিনিস দুইটা। কিন্তু বাস্তবিক দেখিবার মতো জিনিস চাও তো পায়ের উঁচু ঢিবলি দুইটিকে দেখো। ঐ দুইটা নরম তেলোর উপর ভর দিয়া মাছি আমাদের খাবারের উপর দিয়া হাঁটিয়া যায়। খাবার জিনিসে যে পা ঠেকাইতে নাই, অন্তত পাটাকে যে ভালো করিয়া সাবান দিয়া ধোয়া উচিত, সে খেয়াল তো মাছির নাই। সে অখাদ্য ময়লা জিনিসের উপর দিয়া তিনজোড়া চরণ চাপাইয়া সেই চরণের ধূলি আবার

আমাদের খাবারের উপর ঝাড়িয়া যায়। তাহার সঙ্গে কত যে রোগের বীজ চলিয়া আসে, তাহা ভাবিলেও ভয় করে। ঐ পায়ের তেলোটিকে অণুবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করিলে অনেক সময় দেখা যায় উহাতে সাংঘাতিক রোগের বীজ কিল্‌বিল্‌ করিতেছে। সেইজন্য লোকে বলে যে মাছিকে খাবারের উপর বসিতে দিয়ো না। পায়ের তেলোটি আগাগোড়া বোলতার চাকের মতো অসমান—তাহার গায়ে অসংখ্য ছিদ্র—সেই ফুটা দিয়া সে যে-কোনো জিনিসকে চুষিয়া ধরিতে পারে। তাই কাঁচের মতো পালিশ জিনিসের উপরেও চলাফিরা করিতে তাহার কোনো অসুবিধা হয় না। দরকার হইলে ঐ ফুটাগুলির ভিতর হইতে সে একরকম আঠালো রস বাহির করিতে পারে, তাহাতে পা আরো মজবুতভাবে আঁটিয়া বসাইবার সাহায্য হয়।

মাছি উড়িবার সময় প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ছয়শত বার ডানা ঝাপটায়। খুব ব্যস্ত হইলে এক সেকেণ্ডে সে প্রায় বিশ-পঁচিশ হাত উড়িয়া যাইতে পারে। অতটুকু প্রাণীর পক্ষে ইহা বড়ো সামান্য কথা নয়। মাছিটাকে যদি একটা ঘোড়ার মতো বড়ো কল্পনা করা যায় তাহা হইলে তাহার দৌড়টি হয় যেন কামানের গোলার মতো।

বাতাস ছাড়া মানুষ যেমন বাঁচে না—মাছিরও তেমনি নিশ্বাস না লইলে চলে না। আমরা নিশ্বাস লই ফুসফুসে বাতাস পাইবার জন্য। আমাদের বুকের দুপাশে দুটি হাপরের মতো যন্ত্র আছে, তাহারই নাম ফুসফুস বা (Lungs)। ঐ ফুসফুসের মধ্যে বাতাস ঢুকিয়া শরীরের রক্তকে তাজা করিয়া তোলে। মাছির সমস্ত শরীরটাই যেন একটা প্রকাণ্ড ফুস-ফুস। তাহার শরীরের দুপাশে ছোটো-ছোটো ফুটা থাকে—সেইগুলিই তাহার নিশ্বাস লইবার ছিদ্র বা নাক। শরীরের ভিতরে সরু-সরু শিরার মতো অসংখ্য প্যাঁচানো নল তাহার গায়ের রক্তের মধ্যে ডুবানো রহিয়াছে। সেই নলের ভিতর দিয়া বাতাস চলে আর রক্ত তাজা হইয়া উঠে।

আমাদের যেমন অসুখ-বিসুখ আছে, মাছিরও তেমনি। এই এখন আমকাঁঠালের সময় এত মাছি দেখিতেছ, আর কিছুদিন পরেই তাহারা কমিতে আরম্ভ করিবে। এরকম ছাতা-পড়া ব্যারামে প্রতি বৎসর হাজার-হাজার মাছি মারা যায়।

মাছির কথা বলিতে গেলে তাহার জন্মের কথাও বলিতে হয়। আঁস্তাকুড়ের ময়লার মধ্যে বা গোবরের গাদার মধ্যে মাছিরা ডিম পাড়িয়া যায়। খুব ছোটো সাদা সাদা চালের মতো ডিমগুলি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফুটিয়া তাহার ভিতর হইতে একরকম পোকা বাহির হয়। সপ্তাহখানেক ধরিয়া এই পোকাগুলি অল্পে অল্পে বাড়িতে থাকে আর বার বার খোলস বদলায়। তার পর পোকাটা শুকাইয়া কেমন গুটি পাকাইয়া যায়—তাহাতে তামাটে রঙ ধরিয়া আসে। এইভাবে আরো কয়েকদিন থাকিলেই সেই গুটির ভিতর হইতে আস্ত মাছিটা বাহির হইয়া আসে। তার পর তাহার চেহারার আর কোনো পরিবর্তন হয় না। জন্মিবার সময় তার শরীরটি যতটুকু থাকে মরিবার সময়ও ঠিক ততটুকু। সাধারণত আমরা যে-সব মাছি দেখি, তাহাদের ডিমগুলি দেখিতে নিতান্তই সাদাসিধা—তাহার গায়ে কোনো কারিকুরি নাই। কিন্তু এক-একরকম মাছি আছে তাহারা অতি আশ্চর্যরকমের সুন্দর ডিম পাড়ে।

ছারপোকা ও মশা কামড়াইতে জানে, মাছির সে বিদ্যা নাই। সেইজন্য মানুষে ছার-পোকা ও মশা তাড়াইতে যত ব্যস্ত হয়, মাছির ভয়ে ততটা ব্যস্ত হয় না। কিন্তু উৎপাত

হিসাবে মাছিকে কাহারও চাইতে কম বলা যায় না। মেসোপটেমিয়ার যেখানে ইংরেজদের সহিত তুর্কিদের লড়াই চলিতেছে, সেখানে গ্রীষ্মকাল আসিলেই মাছির উপদ্রব এমন সাংঘাতিক হইয়া উঠে যে, কেবল মাছি মারিবার জন্যই হাজার-হাজার টাকা খরচ করিয়া নানারকম কলকৌশল খাটাইতে হয়। মাছি যেখানে হাজারে হাজারে লাখে লাখে ঘুরিয়া বেড়ায় সেখানে কেবল হাতে মারিয়া তাহাদের কত শেষ করিবে ? নানারকম ফাঁদ পাতিয়া বিষাক্ত খাবারের লোভ দেখাইয়া একেবারে দলে দলে তাহাদের বংশকে বংশ উজাড় করিতে হয়। তা না হইলে সেদেশে মানুষের তিষ্ঠানো দায় হয়।

অদ্ভুত মাছ

নদীতে আর সমুদ্রে যতরকম মাছ পাওয়া যায় তাহার মধ্যে অদ্ভুত মাছের কোনো অভাব নাই। কাহারও চেহারা অদ্ভুত, কাহারও চালচলন অদ্ভুত, কাহারও আহার বিহার বাসাবাড়ি সবই অদ্ভুত। বাস্তবিক ইহার মধ্যে কোনটার কথা যে বলিব আর কোনটা যে বাদ দিব তাহা ঠিক করাই কঠিন !

প্রথমে চারিচক্ষু মাছের কথা বলি। মাকড়সার নাকি আট-দশটা চোখ থাকে কিন্তু পোকামাকড় ছাড়া আর কোনো প্রাণীর যে দুইটার বেশি চোখ হয় এ কথা আর শুনিয়াছ কি ? কোনো কোনো জানোয়ারের দেখা যায় কপালের কাছে একটা করিয়া চোখের মতো থাকে—কিন্তু 'চোখের মতো' হইলেও সেটা চোখ নয়, তাহাতে দেখার কাজ চলে না। কিন্তু এই মাছের যে দুজোড়া চোখ, তাহার প্রত্যেকটিই সত্যিকারের চোখ। দুই-দুইটা চোখ একসঙ্গে উপর-নীচ করিয়া বসানো ; মাছ যখন জলে ভাসে তখন উপরের একজোড়া চোখ থাকে জলের বাহিরে, আর নীচের জোড়া জলের তলায়। যে জোড়া জলের উপরে থাকে তাহার গড়ন ঠিক সাধারণ মাছের মতো নয়—তাহাতে জলের নীচে দেখিবার সুবিধা হয় না। আর নীচের জোড়া ঠিক সাধারণমতো চোখ, তাহাতেও জলের বাহিরের কোনো জিনিস স্পষ্ট দেখা যায় না। জলের ভিতর ও বাহির একসঙ্গে দেখিবার বিশেষ কোনো দরকার ইহার ছিল কিনা জানি না, কিন্তু এ ব্যবস্থাটায় যে কাজের কতকটা সুবিধা হয় তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। একরকম চশমা আছে তাহাকে 'বাইফোক্যাল্' বলে—সেই চশমার উপরের আধখানা একরকম কাঁচ, তাহাতে দূরের জিনিস দেখিবার সুবিধা হয়, আর নীচের আধখানা আরেকরকম—তাহাতে পড়াশুনার কাজ চলে। এই মাছের চোখটা ঠিক যেন 'বাইফোক্যাল্' চোখ।

চোখের কথা বলিতে গেলে আরেকটি মাছের কথাও বলিতে হয়। সে মাছের একদিকে দুইটা চোখ, আর-একদিকে চোখ নাই। এরকম একদিক কানা হইবার অর্থ কি জান ? মাছটার স্বভাব এই যে, সে কাদার মধ্যে কাত হইয়া শুইয়া থাকে। যেদিকটা কাদার মধ্যে অন্ধকারে পড়িয়া থাকে, সেদিকটায় চোখ থাকা না থাকা সমান কথা—তাই

তাহার দুইটা চোখই থাকে মুখের একপাশে--যে পাশটা আকাশের দিকে ফিরানো সেই পাশে।

আফ্রিকার নীল নদীতে একরকম মাছ আছে সে চিৎ হইয়া চলে। চলার এরকম অদ্ভুত ভঙ্গি হইবার একমাত্র কারণ যাহা দেখা যায় তাহা এই যে ইহাদের পেটের চাইতে পিঠের রঙটা অনেক বেশি সাদা। সাদা পিঠটা আলোর দিকে থাকিলে চক্‌চক করে—তাহাতে মাছটার গা-ঢাকা দিয়া থাকিবার সুবিধা হয় না। তাই সে কালো পেটটাকে উপর দিকে ধরিয়া আপনাকে জলের মধ্যে বেশ বেমালুম করিয়া রাখে।

জানোয়ারের মধ্যে মানুষ ক্যাঙারু প্রভৃতি জন্তু যেমন খাড়া হইয়া চলে, মাছেদের মধ্যেও এমন এক-একজন আছেন যাঁহারা মানুষের মতো খাড়া হইয়া চলেন। বিশেষত একজন আছেন, তিনি সমুদ্রে থাকেন, তিনি কেবল খাড়া থাকিয়াই সন্তুষ্ট হন না—তাঁহার মাথাটি আবার নীচের দিকে রাখা চাই। এই মাছের চেহারাটিও অদ্ভুত ছুঁচলো রকমের, তাই ইংরাজিতে ইহার নাম Needle fish বা ছুঁচ মাছ। সমুদ্রে একরকম চাঁদা মাছ আছে, তাহারা রাগিলে বা ভয় পাইলে পেটটাকে ফুটবলের মতো ফুলাইয়া হঠাৎ চিৎ হইয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠে। তখন ফোলা পেটটি জলের উপর বাহির হইয়া ভারি অদ্ভুত দেখায়। কোনো কোনো চাঁদা মাছের গায়ে আঁশের বদলে কাঁটা বসানো থাকে—রাগের সময় সেগুলি সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হইয়া উঠে।

চেহারার কথা যদি বল, মাছের চেহারা যে কত অদ্ভুতরকমের হইতে পারে তাহার কিছু কিছু নমুনা দেওয়া হইতেছে। 'থলে-গলা চাবুক-লেজ' মাছের গলায় লম্বা থলি আর ল্যাজটি চাবুকের মতো ; বঁড়শিবাজ মাছের নাকের উপর ছড়ি, তাহার আগায় টোপের মতো নোলক, আর যার যত বড়ো গা তত বড়ো হাঁ ; শয়তান মাছের চেহারাটা মুখোশপরা সঙের মতো। আমেরিকার রাক্ষুসে মাছের সাংঘাতিক দাঁতের কামড়ে গোরু ঘোড়া পর্যন্ত প্রাণ হারায়—তাহারও চেহারাটি নেহাত ভদ্রমতন নয়।

কিন্তু বাস্তবিক উদ্ভট বিদঘুটে মাছের খোঁজ করিতে হইলে সমুদ্রের গভীর জলে যে-সব মাছ থাকে, তাহাদের সংবাদ লইতে হয়। সেদিন এইরূপ কতকগুলি মাছের চমৎকার বর্ণনা পড়িয়াছি। তাহার দু-একটি নমুনা শুন। একটি মাছ, তাহার কপালের উপর দুইটা শিং—সেই শিঙের আগায় তাহার চোখ। শিং দুটাকে সে ইচ্ছামতো এদিক-ওদিক ফিরাইতে পারে। তাহার গায়ে আবার সারি সারি আলো বসানো—গভীর অন্ধকার সমুদ্রে সেগুলি আপনা হইতেই জ্বলিতে থাকে। আর-একটা মাছ, তাহার মুখে লম্বা দাড়ি— দেখিতে অনেকটা গাছের পাতার মতো ; তাহার উপর মুখভরা বড়ো-বড়ো গজালের মতো দাঁত। অন্ধকারে সমস্তটা দাড়ি জ্বলিতে থাকে। আরেকটি মাছ তাহার চোখ দুইটা ঠোঁটের কানায়, মনে হয় হাঁ করিলেই চোখ দুইটা গিলিয়া যাইবে। ইহার নাকটা জুতার গোড়ালির মতো উঁচু আর হাঁ করিলেই মুখের ভিতরে আলো জ্বলিয়া উঠে—শিকার ধরিবার ভারি সুবিধা। আর-একটি মাছ আছে, তাহার সমস্ত শরীরটি লাল-কালো চিত্রবিচিত্র করা। তাহার চোখদুইটা এত বড়ো যে হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যে সমস্ত মাথাভরাই চোখ।

ইহারা সকলেই প্রায় শিকারী মাছ। নিজেদের বাতি দিয়া ইহারা শিকার খোঁজে ! কেহ

কেহ সমুদ্রের নীচে বাতি জ্বালাইয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে ; সেই বাতি দেখিয়া যে-সব শিকার তামাশা দেখিতে আসে, তাহাদের খপ্‌ করিয়া গিলিয়া খায়। কোনো কোনো মাছ আছে, তাহারা শিকারকে বাগাইবার জন্য নানারকম অস্ত্রকৌশল খাটাইয়া থাকে। কাহারও বিষাক্ত ল্যাজ চাবুকের মতো শিকারের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে, কেহ বিদ্যুৎ চালাইয়া শিকারকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলে, কেহ জোঁকের মতো তাহার রক্ত চুষিয়া ধরে আর কেহ পিচকারি মারিয়া ডাঙার শিকারকে জলে পাড়িয়া আনে। টিকটিকির শিকার ধরা দেখিয়াছ ? কোনো কোনো মাছ আছে তাহারাও ঠিক সেইরকম কায়দায় শিকার ধরে। আস্তে আস্তে চুপিচুপি শিকারের পিছনে গিয়া তার পর হঠাৎ, টিকটিকির জিভের মতো, তাহাদের মুখটা সরু লম্বা হইয়া শিকারের ঘাড়ে ছুটিয়া পড়ে !

এইবারে একটা মাছের কথা বলিব আমরা তাহার নাম দিয়াছি গেছো মাছ। কোনো কোনো মাছ আছে, তাহারা জলের বাহিরে আসিয়াও অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাঁচিতে পারে ! কৈ মাছ যে অনেকদূর পর্যন্ত মাটির উপর 'কাতরাইয়া' চলিতে পারে, তাহা বোধ হয় সকলেই দেখিয়াছ। কিন্তু মাছ যে আবার শখ করিয়া জল ছাড়িয়া ডাঙায় ওঠে আর রীতিমতো গাছে চড়িতে পারে, ইহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন। এই মাছ আফ্রিকাতেই বেশি পাওয়া যায়। ইহার দু পাশের ডানা দুইটা দেখিতে কতকটা আঙুল-জোড়া পায়ের মতো। সেই ডানার উপর ভর করিয়া মাছগুলি অনায়াসে ডাঙায় উঠিয়া গাছে চড়িয়া বসে। ইহাদের মুখ প্রায়ই ব্যাঙের মতো কদাকার হয়—চোখদুটাও সেইরকম ড্যাব্‌ডেবে। এ মাছ খাইতে এমন বিস্বাদ যে মানুষ তো দূরের কথা—ডাঙার কোনো জন্তু বা আকাশের পাখিরা পর্যন্ত ইহাকে ছোঁয় না। কিন্তু জলের বড়ো-বড়ো মাছগুলি ইহাদের দেখিলে টপাটপ্‌ খাইয়া ফেলে। সেইজন্য ইহারা জল ছাড়িয়া ডাঙায় উঠিবার জন্য এক-এক সময়ে এমন ব্যস্ত হইয়া উঠে।

মাছের বিদ্যার অনেক কথা বলা হইল—এইবার আরেকটি বিদ্যার কথা বলিয়াই শেষ করি। সেটি আর কিছু নয়—সংগীতবিদ্যা ! অবশ্য সংগীত বলিতে মনে করিও না যে তাহারা রীতিমতো সা-রে-গা-মা সুর করিয়া রাগ-রাগিণীর চর্চা করে। কোনো কোনো মাছ আছে তাহারা একটু-আধটু শব্দ করিতে জানে। কেহ ইঁদুরের মতো কুট্‌কুট্‌ শব্দ করে, কেহ অদ্ভুতরকম ঘঁৎ ঘঁৎ শব্দ করে, আর কেহ-বা ডুর্‌ ডুর্‌ করিয়া ঢাকের মতো আওয়াজ করে। কিন্তু সকলের চাইতে ওস্তাদ যে মাছ, সে দলেবলে সমুদ্রের তীরে পড়িয়া মোটা কান্নার মতো একরকম অদ্ভুত সুর করিতে থাকে ! খানিক দূর হইতে শুনিলে হঠাৎ মনে হয় যেন মানুষের কোলাহলের সুর।

জানোয়ারের ঘুম

এক-একজন মানুষের ঘুমাইবার ধরন দেখি এক-একরকম। কেউ চুপচাপ নিরীহভাবে জড়োসড়ো হইয়া ঘুমায়, কেউ ঘুমের মধ্যে হাত-পা ছুঁড়িয়া এপাশ-ওপাশ করিয়া অস্থির হয়,

কেউ-বা তুমুল নাসিকাগর্জনে রীতিমতো যুদ্ধের কোলাহল সৃষ্টি করিয়া তোলে। মাঝে মাঝে এক-একজন লোক দেখি তাহাদের আর কোনো ক্ষমতা থাক বা নাই থাক ঘুমাইবার শক্তিটা খুব অসাধারণ। যেখানে সেখানে উঠিতে বসিতে তাহারা বেশ একটু ঘুমাইয়া লয়। পাখা-কুলি পাখা টানিতে টানিতে ঘুমাইয়া পড়ে, পণ্ডিতমহাশয় পড়াইতে পড়াইতে ঢুলিতে থাকেন, আর ছোটো-ছোটো ছেলেরা গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমের ঘোরেই হুঁ হুঁ করিতে থাকে। যুদ্ধের সময়ে ক্রমাগত কয়েকদিন রাত জাগিয়া এবং হয়রান হইয়া সৈন্যেরা যখন শিবিরে ফিরে, তখন অনেক সময়ে দেখা যায় তাহারা চলিতে চলিতেই ঘুমের ঘোরে মাতালের মতো টলিতেছে।

গল্পে শুনিয়াছিলাম, এক ব্রাহ্মণ পুরোহিত শিষ্যবাড়ি গিয়াছিলেন—শীতের সময়ে। সেখানে পাড়াগাঁয়ে শীতটা কিরকম হয় তাঁহার জানা ছিল না। তাই শিষ্য যখন লেপ দিতে চাহিল তখন তিনি বারণ করিয়া বলিলেন, "আমার শীত-টীত কিছু লাগে না।" কিন্তু 'লাগে না' বলিলেই তো আর শীত দূর হয় না ; কাজেই রাত্রে যখন ঠাণ্ডা বাড়িয়াই চলিল তখন ঠাকুর মহাশয়ের দুরবস্থা কেমন হইয়াছিল, শিষ্য তাহার বর্ণনা দিয়াছেন অতি চমৎকার—

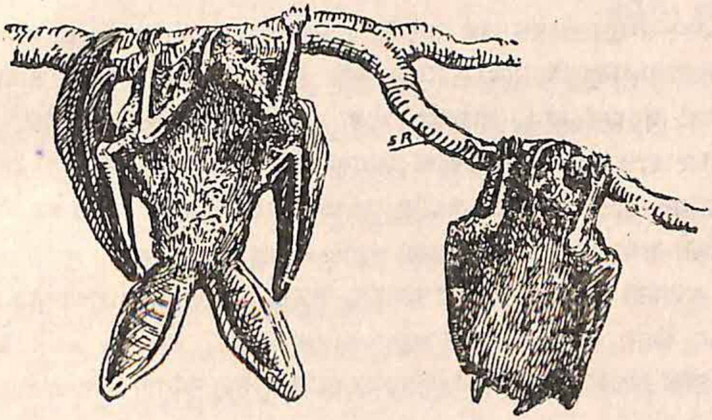
"প্রথম প্রহরে প্রভু ঢেঁকি অবতার
দ্বিতীয় প্রহরে প্রভু ধনুকে টংকার।
তৃতীয় প্রহরে প্রভু কুকুর কুণ্ডলী
চতুর্থ প্রহরে প্রভু বেনের পুঁটুলি।"

প্রথমে ঢেঁকির মতো সটান সোজা, তার পর ক্রমে ধনুকের মতো বাঁকানো, তার পর কুকুরের মতো হাত-পা গুটাইয়া জড়োসড়ো, তার পর শীতে তাল পাকাইয়া একেবারেই পুঁটুলির মতো গোল।

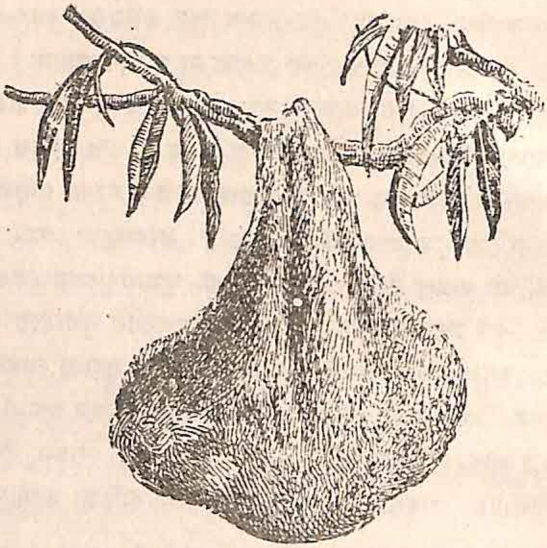
জানোয়ারদের ঘুমের কায়দা যদি দেখ, তবে ইহার চাইতেও অনেক বেশি রকমারি পাইবে। কেহ চোখ বুজিয়া ঘুমায়, কেহ চোখ চাহিয়াই ঘুমাইয়া থাকে। কেহ দিনে জাগিয়া রাত্রে ঘুমায়, কেহ প্যাঁচার মতো নিশাচর হইয়া সারারাত জাগিয়া কাটায়। আস্তাবলে ঘোড়াগুলি খাড়া দাঁড়াইয়া ঘুম দেয় কিন্তু মহিষ বা গণ্ডার কাদা জলে গলা পর্যন্ত ডুবাইয়া আরাম করিয়া ঘুমায়। চিড়িয়াখানায় কতগুলি বাঁদর দেখিয়াছি তাহারা দল বাঁধিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া একসঙ্গে বসিয়া ঘুমাইতেছে, আবার কোনো-কোনোটা দেখি ঠিক মানুষের মতো শুইয়া হাত-পা এলাইয়া ঘুমায়। একটা ওরাংওটান দেখিয়াছিলাম, সে একটি দোলনার উপর পেটের ভর দিয়া হাত পা ঝুলাইয়া ঘুমাইতেছিল। ইহাতে তাহার যে কিছুমাত্র অসুবিধা হইতেছে এরূপ বোধ হইল না। অনেক জন্তুই ঘুমাইবার সময় ঠাণ্ডা ছায়া খোঁজে, কিন্তু নদীর ধারের কুমিরগুলি দুপুর রোদে চড়ায় পড়িয়া হাঁ করিয়া ঘুমাইয়া থাকে। আবার কত জন্তু আছে তাহারা শীতকালটা বা গ্রীষ্মের গরমটা কুম্ভকর্ণের মতো লম্বা ঘুম দিয়া কাটায়। ভল্লুক সাপ ব্যাঙ গেঁড়ি প্রভৃতি কোনো কোনো জন্তু এ বিদ্যায় বেশ পাকা ওস্তাদ। পরিষ্কার দিন হইলেই কাঠবিড়ালিগুলা রোদে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করে, কিন্তু ঠাণ্ডা মেঘলা দিন দেখিলে তাহারা অনেকেই গাছের ফাটলে কোটরে ঢুকিয়া ঘুমাইয়া থাকে—আবার পরিষ্কার রোদ না

হওয়া পর্যন্ত সে ঘুম ভাঙিতে চায় না। যে-সকল জন্তু এইরকম লম্বা-লম্বা ঘুম দেয়, ঘুমের সময় তাহারা দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ না খাইয়া কাটায়। এই সময়ে তাহাদের শরীরটা প্রায় অসাড় ও নিষ্কর্মা হইয়া পড়ে—এমন-কি, নিশ্বাস প্রশ্বাসও অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া আসে। এইরকম লম্বা ঘুমের পর তাহারা যখন আবার বাহির হয় তখন দেখা যায় যে শরীরের চর্বি শুকাইয়া তাহাদের চেহারা অত্যন্ত কাহিল হইয়া পড়িয়াছে।

পাখিরা কেমন করিয়া ঘুম যায় দেখিয়াছ তো? কাকাতুয়া যেমন দাঁড়ে বসিয়া ঘুমায়, সেইরকম অনেক পাখিই গাছের উপর খাড়া বসিয়া ঘুমায়। কেহ কেহ পা মুড়িয়া মাটির উপর চাপিয়া বসে। বক যে এক ঠ্যাঙে দাঁড়াইয়া চমৎকার ঘুমাইতে পারে তাহা সকলেই জান। প্যাঁচা প্রভৃতি কোনো কোনো পাখি ঘুমাইবার সময়ে গায়ের পালক ফুলাইয়া আপনা-দের শরীরটাকে প্রায় দ্বিগুণ বড়ো করিয়া তোলে। একরকম চন্দনা আছে তাহারা ঠিক বাদুড়ের মতো গাছের ডালে ঝুলিয়া ঝুলিয়া ঘুমায়। বাদুড় কেমন করিয়া ঘুমায় তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ—তাহারা মাথা নীচের দিকে রাখিয়া ডানামুড়িয়া ঝাঁকে ঝাঁকে



গাছের ডাল হইতে ঝুলিয়া থাকে। সে এক চমৎকার দৃশ্য। শীতের সময়ে কলিকাতার ইডেন গার্ডেন্‌সে মাঝে মাঝে বাদুড়ের ঝাঁক দেখিয়াছি। বাদুড়েরা নাকি দিনেরবেলায় ঘুমায়, কিন্তু এগুলি যেরকম ক্যাট্ ক্যাট্ শব্দ আর ছট্‌ফট্ করিতেছিল তাহাই যদি ঘুমের নমুনা হয়, তবে না জানি সে কিরকমের ঘু'। ঘুমাইবার পূর্বে বাদুড়েরা যেরকম ঘটা করিয়া ঘুমের আয়োজন করে, তাহা দেখিলে বাস্তবিকই হাসি পায়। যে লম্বকর্ণ বাদুড় বা চামচিকার ছবি এখানে দেওয়া হইল ইনি ঘুমাইবার সময় প্রথমেই গাছের ডাল আঁকড়াইয়া ঝুলিয়া পড়েন তার পর ডানা দুইটি দু-চার বার ঝাড়িয়া খুব সাবধানে ভাঁজ করিয়া বন্ধ করেন। তার পর ফট্ করিয়া একটি প্রকাণ্ড কান মুড়িয়া যায়; খানিক বাদে সে আর একটি কানও ঠিক ঐরকম হঠাৎ গুটাইয়া লয়—তখন আর তাহাকে চিনিবার জো থাকে না। বাদুড়ের কথা বলিতে গিয়া আরেকটা জন্তুর কথা মনে হয়, সে আপনাকে রীতিমতো 'বেনের পুঁটুলি' পাকাইয়া ঘুমায়। তখন তাহাকে দেখিলে হঠাৎ জানোয়ার বলিয়া চিনিতে পারাই অসম্ভব।



মনে হয়. যেন একটা প্রকাণ্ড ফল বা মৌচাক ঝুলিয়া আছে। এই জন্তুর নাম কোবেগো। দেখিতে কতকটা বাদুড়ের মতো হইলেও এটি বাদুড় নয় এবং ইহার ডানাটা বাদুড়ের ডানার মতো ছড়ানো নয়। বাদুড়ের মতো উড়িতে না পারিলেও ইহারা এই ডানায় ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে লাফ দিয়া একশো-দেড়শো হাত পার হইয়া যায়। ইহাদের ছানাগুলি বাঁদরের ছানার মতো সবসময়ে মায়ের বুক আঁকড়াইয়া থাকে। এইরকম পুঁটুলি পাকাইবার অভ্যাসটা 'বর্মধারী' বা 'আর্মাডিলো' প্রভৃতি আরও কোনো কোনো জন্তুও দেখা যায়।

মাথা ঝুলাইয়া ঘুমানো যাহাদের অভ্যাস, তাহাদের মধ্যে আর একজনের কথা বলিয়া শেষ করি। ইহার ইংরাজি নাম 'স্লথ' অর্থাৎ অলস। বাস্তবিক এমন ঢিলা স্বভাবের অলস জন্তু আর বড়ো দেখা যায় না। গাছের ডালে ঝুলিয়া ঝুলিয়া আর অকাতরে ঘুমাইয়া



ইহারা সারাবছর কাটাইয়া দেয়। চিৎ হইয়া মাঝে মাঝে নীচের দিকে তাকানো মাঝে মাঝে হাত বাড়াইয়া গাছের পাতা খাওয়া, আর যখন তখন ঘাড় গুঁজিয়া ঘুমানো—ইহাই যেন ইহাদের জীবনের কাজ। যখন এক ডালের পাতা ফুরাইয়া গেল, তখন আর-এক ডালে যাওয়াটা যেন ইহাদের পক্ষে প্রাণান্তকর। ধীরে ধীরে একটু-একটু করিয়া ভুঁড়ি দোলাইয়া, আস্তে আস্তে হাত-পা বাড়াইয়া আধ মিনিটের কাজ আধ ঘণ্টায় সারিতে না সারিতে ইহারা আবার পরিশ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। বাস্তবিক ইহারা এমন অলস যে অনেক সময়ে ইহাদের মাথায় একরকমের শ্যাওলা গজাইয়া সবুজ রঙের স্যাঁৎলা পড়িয়া যায়। পুরাণে বলে, বাল্মীকি, চ্যবন প্রভৃতি ঋষিরা ধ্যানে বসিলে তাঁহাদের গায়ে উইয়ের ঢিপি গজাইয়া-ছিল। ইনি সারাদিন চিৎপাত হইয়া যে কিসের ধ্যান করেন তাহা জানি না—কিন্তু মাথায় শ্যাওলা না গজাইয়া আরেকটু বুদ্ধি গজাইলে বোধ হয় কতকটা সুবিধা হইত।

তিমির ব্যবসা

কথায় বলে 'ঠেলায় পড়লে বাঘেও ধান খায়'। ১৮৭১ খৃস্টাব্দে জার্মানরা যখন পারিস শহর ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল তখন পারিসের লোকেরা খাবারের অভাবে ঘোড়ার মাংস খাইতে বাধ্য হয়। তাহার আগে ইউরোপের লোকে ঘোড়ার মাংস খাইত না। কিন্তু এই সময় হইতে দেখা গেল যে ঘোড়ার মাংসটা খাইতে লাগে মন্দ নয়। এখন শুধু পারিসে নয়, ইউরোপের অন্যান্য বিস্তর শহরেও লোকে শখ করিয়া ঘোড়ার মাংস খাইয়া থাকে। তাহার জন্য আর 'ঠেলায় পড়িবার' দরকার হয় না।

এখন যে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে, তাহাতেও খাদ্য-সমস্যা একটা মস্ত সমস্যা। চল্লিশ পঞ্চাশ বা ষাট লক্ষ লোক এক-এক দিকে যুদ্ধ করিতেছে, কেবল তাহাদের খাওয়া জোগাইলেই নিশ্চিন্ত হইবার জো নাই—সমস্ত দেশের লোক কি খাইবে, কি পরিবে, তাহার ভাবনাও প্রত্যেক দেশের শাসনকর্তাদের ভাবিতে হয়। ইউরোপের খাওয়া জোগাইবার ভার এখন অনেক পরিমাণে আমেরিকার উপরে পড়িয়াছে। ইউরোপের লোকেরা মাংস-খোর জাতি, প্রতি বৎসর তাহারা লক্ষ লক্ষ মণ মাংস খাইয়া শেষ করে। এত মাংস চালান দেওয়া কি কম কথা? বিদেশ হইতে জাহাজে করিয়া ইংলণ্ডে যে-সব খাবার জিনিস চালান আসে জার্মান জলদস্যু ডুবুরী জাহাজ সেইগুলিকে নষ্ট করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাতেও কত খাবার সমুদ্রে ডুবিয়া নষ্ট হয়।

আমেরিকার বুদ্ধিমান লোকে এই সমস্যার একটা মীমাংসা করিয়াছেন বড়ো চমৎকার। তাঁহারা তিমির মাংস প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহার মধ্যেই আমেরিকার নানা স্থানে এই মাংসের ব্যবসায় আরম্ভ হইয়াছে—তিমি ধরিয়া তাহার মাংস চালান দিবার জন্য বড়ো-বড়ো কারখানা বসিয়াছে। তাহার একটিমাত্র কারখানা হইতে বছরে ৯০০০ মণ মাংস টিনে ভরিয়া চালান দেওয়া হয়। নূতন কোনো খাওয়ার অভ্যাস মানুষ সহজে ধরিতে

চায় না, সেইজন্য আমেরিকার একদল লোকে বক্তৃতা করিয়া, কাগজেপত্রে লিখিয়া, বায়োস্কোপে ছবি দেখাইয়া এ বিষয়ে মানুষের মনের বিরোধ ভাঙিতেছেন। আমেরিকার কোনো কোনো শহরে প্রকাশ্য বাজারে দশ-আনা সেরে তিমির মাংস বিক্রয় হইতেছে।

গোরু ঘোড়া শূকর কিছুতেই যাহাদের আপত্তি নাই তাহারা যে তিমি খাইতে বেশি দিন আপত্তি করিবে, এরূপ বোধ হয় না। যাঁহারা ইহার মধ্যেই ও জিনিসটা খাইতে অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন—চমৎকার মাংস! ইউরোপের বাজারে ইহাকে গো-মাংস বলিয়া চালাইলেও কেহ কোনো তফাত বুঝিবে কিনা সন্দেহ।

সবরকম তিমির মাংস খাইতে ভালো নয়। যেগুলি বিশেষভাবে খাওয়ার উপযোগী সেগুলি সাধারণ ছোটোখাটো তিমি—অর্থাৎ মোটে কুড়ি-পঁচিশ হাত লম্বা! মোম তিমি বা sperm whale লম্বায় খুব বড়ো হয়—এক-একটা ষাট হাত পর্যন্ত দেখা গিয়াছে। সব-চাইতে বড়ো যে তিমি সেগুলি থাকে একেবারে উত্তরে, মেরু সমুদ্রের কাছে—তাহারা লম্বায় মোম তিমির সমান, কিন্তু অনেকখানি চওড়া ও মোটা এবং ওজনেও প্রায় দেড়া। এক-একটি বড়ো তিমির ওজন চারহাজার মণেরও বেশি হয়—অর্থাৎ ত্রিশ-চল্লিশটা বড়ো-বড়ো হাতির সমান। এই-সমস্ত অতিকায় তিমি আগে সমুদ্রের মধ্যে অনেক দেখা যাইত, কিন্তু মানুষের অত্যাচারে ইহাদের বংশ ক্রমে প্রায় উজাড় হইয়া আসিতেছে।

তিমি নানারকমের হয়—তাহাদের মোটের উপর দুই দলে ভাগ করা যায়। এক দলের দাঁত নাই, আর এক দলের দাঁত আছে। যেগুলার দাঁত নাই তাহাদের মুখের ভিতরে প্রকাণ্ড চিরুনির ঝালরের মতো একটা জিনিস থাকে, তাহাকে বলে কাঁচকড়া বা whale bone। এই জিনিসটা মানুষের অনেক শৌখিন কাজে লাগে এবং বাজারে বিক্রয় করিলে বেশ দামও পাওয়া যায়। তা ছাড়া এক-একটা তিমির গায়ে যে পরিমাণ তেল বা চবি থাকে তাহার দামও বড়ো সামান্য নয়। যে মোম তিমির কথা আগে বলিয়াছি তাহার মুখে কাঁচকড়া নাই কিন্তু তাহার মাথার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা ভরা মোম থাকে! এই মোমের চমৎকার বাতি হয় এবং নানারাকম মলম প্রভৃতি হয়। এই মোম চবি ও কাঁচকড়ার জন্য মানুষে সমুদ্রের নানা স্থানে বড়ো-বড়ো তিমিগুলিকে নিঃশেষ করিয়া এখন ছোটোখাটো তিমির পিছনে লাগিয়াছে।

যে-সব 'ছোটোখাটো' তিমির কথা বলা হইল, তাহাদের এক-একটাকে মারিলে প্রায় তিন-চারশত মণ মাংস পাওয়া যায়। আজকাল তিমির ব্যবসা অনেক কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু গত দুই বৎসরে কেবল উত্তর আমেরিকায় প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলেই বারোশতের বেশি তিমি মারা হইয়াছে। এখন এ ব্যবসায়ে আরো লাভ হইবার কথা, কারণ এখন হইতে তিমির হাড় মাংস চবি চামড়া সমস্তই কাজে লাগানো চলিবে। এতকাল চবি ও কাঁচকড়া বাহির করিবার পর অত বড়ো প্রকাণ্ড দেহটাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইত—তাহাতে কেবল হাজার হাজার জলজন্তুর খোরাক জুটিত। কিন্তু এখন সেই মাংসে মানুষের উদরপূর্তি হইবে। এইরূপ একটা তিমিকে মারিলে স্বচ্ছন্দে বিশ-ত্রিশ হাজার লোকের ভোজের আয়োজন হইতে পারে। তার পর কংকালটুকুও ফেলিবার জিনিস নয়—তাহাকে পোড়াইয়া চমৎকার জমির সার ও নানারকম ঔষধ তৈয়ারি হইবে। চামড়াটায় চবি ভরা

বলিয়া তাহাকে অনেকদিন পর্যন্ত কাজে লাগাইবার সুবিধা হয় নাই—এখন তিমির ছাল কলে পিষিয়া চর্বি বাহির করিয়া চমৎকার মজবুত চামড়া তৈয়ারি হইতেছে। সুতরাং মানুষের মতো এ-হেন অত্যাচারী রাক্ষসের হাত এড়াইবার জন্য তিমি গভীর সমুদ্রে পলাইয়া হয়তো এখনো বাঁচিতে পারে—না হইলে তাহার বংশ লোপ হওয়ার খুবই আশংকা আছে।

এত বড়ো প্রাণীটা, কিন্তু মোটের উপর তাহার স্বভাবটি বেশ নিরীহ বলিতে হইবে। অনেক সময়ে দেখা যায় তিমির দল সমুদ্রের উপর ভাসিয়া ভাসিয়া খেলা করিতেছে; তাহাদের একটাকে মারিলে বাকিগুলা ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে ভিড় করিয়া আসে। তখন একটার পর একটাকে বল্লমে গাঁথিয়া দলকে-দল মারিয়া ফেলা খুবই সহজ হইয়া পড়ে। কিন্তু সব তিমি সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটে না। কোনো কোনো দাঁতওয়ালা তিমি আছে, তাহাদের মেজাজটা দস্তুরমতো বদরাগী। এ বিষয়ে মোম তিমির দুর্নাম সবচাইতে বেশি। মাঝে মাঝে এক-একটা দলছাড়া মোম তিমি দেখা যায়, তাহাদের ঘাঁটাইবার দরকার হয় না—জাহাজ দেখিলেই তাহারা তাড়া করিয়া যায়। তিমির তাড়া যে কেমন তাড়া, সে তাড়া যে খাইয়াছে সেই জানে। কখনো সে ঢুঁ মারে, কখনো সে হাঁ করিয়া কামড়াইতে আসে, কখনো তাহার গায়ের ধাক্কায় জাহাজ চুরমার হয়—অথবা লেজের ঝাপটায় প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত করে, এই ভয়ে মাঝি-মাল্লা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। আর যাহাদের 'নিরীহ তিমি' বলি, তাহারাও যখন মরিবার সময় সমুদ্র তোলপাড় করিয়া ছট্‌ফট্‌ করে তখন সেও প্রকটা কম সাংঘাতিক ব্যাপার হয় না।

তিমির খাওয়ার মধ্যেও রকমারি দেখা যায়। যাহাদের দাঁত নাই, তাহারা সমুদ্রের মধ্যে ছোটো-ছোটো মাছের ঝাঁক খাইয়া বেড়ায়। এক-এক বার হাঁ করিয়া মাছের ঝাঁক-সুদ্ধ সমুদ্রের জল মুখের ভিতর পুরিয়া লয়; তার পর সেই কাঁচকড়ার ঝালরের ভিতর দিয়া সেই জল ফুঁকিয়া বাহির করে—মাছগুলা সব এই অদ্ভুত ছাঁকনিতে আটকাইয়া থাকে। ইহাদের গলার ফুটা এত ছোটো যে নিতান্ত পুঁটি বাটা ছাড়া কোনো বড়ো মাছ গেলা ইহাদের সাধ্য নয়। কিন্তু দাঁতালো তিমিরা এরকম খুচরা খাইয়া সন্তুষ্ট হয় না। তাহারা বড়ো-বড়ো সমুদ্রের জন্তুকে মারিয়া খায়। মোম তিমিরা এক মাইল গভীর সমুদ্রে ডুব মারিয়া সেখান-কার বড়ো-বড়ো বিদ্‌ঘুটে জন্তুগুলাকে খাইতে ছাড়ে না। একবার একটা তিমির পেটে একটা প্রকাণ্ড অক্টোপাসের কিছু কিছু টুকরা পাওয়া গিয়াছিল। তাহার এক-একটি পা হাতির পায়ের সমান মোটা! সে জন্তুটা যে আট-দশটা হাতির সমান বড়ো ছিল, তাহাতে আর কোনো সন্দেহ নাই।

'তিমি মাছ' যে আসলে মাছই নয়, সে কথা তোমরা নিশ্চয়ই জান। ইহারা স্তন্যপায়ী জন্তু। ইহাদের এক-একটি ছানা হয় ঘোড়ার মতো মস্ত; তাহারা জন্মিয়া মায়ের দুধ খায়। মাছ যেমন অনায়াসে জলের নীচে ডুবিয়া থাকে—তিমি সেরকম পারে না। নিশ্বাস লইবার জন্য তাহাকে বার বার জলের উপরে উঠিতে হয়। কখনো কখনো জোরে নিশ্বাস ছাড়িবার সময় তাহার নাক হইতে গরম বাতাসের ঝাপটা ছুটিয়া সমুদ্রের উপর জলের ফোয়ারা উঠিতে থাকে। তাহা দেখিয়া শিকারীরা বুঝিতে পারে—ঐখানে তিমি।

জানোয়ার এঞ্জিনিয়ার

পাখির মধ্যে কাক, আর পশুর মধ্যে শেয়াল—বুদ্ধির জন্য মানুষে ইহাদের প্রশংসা করে। কিন্তু এখন যে জন্তুটির কথা বলিব, তাহার বুদ্ধি শেয়ালের চাইতে বেশি কিনা, সেটা তোমরা বিচার করিয়া দেখ। এই জন্তুর বাড়ি উত্তরের শীতের দেশে—বিশেষত উত্তর আমেরিকায়। ল্যাজসুদ্ধ দুহাত-লম্বা জন্তুটি, দেখিতে কতকটা ইঁদুর বা 'গিনিপিগে'র মতো, তাহার চেহারায় বিশেষ কোনো বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহার কাজ যদি দেখ, তবে বুঝিবে সে কত বড়ো কারিকর। জানোয়ারের মধ্যে এত বড়ো 'এঞ্জিনিয়ার' আর দ্বিতীয় নাই। ইহার নাম বীভার।

মৌমাছির চাক, মাকড়সার জাল, পিঁপড়ার বাসা প্রভৃতি অনেক ব্যাপারের মধ্যে আমরা খুব কৌশলের পরিচয় পাই—কিন্তু বীভারের বুদ্ধি কৌশল আরো অদ্ভুত। ইহারা বড়ো-বড়ো বাঁধ বাঁধিয়া নদীর স্রোত আটকাইয়া রাখে, জঙ্গলের বড়ো-বড়ো গাছ কাটিয়া ফেলে এবং সেই গাছের 'লাক্‌ড়ি' বানাইয়া নানারকম কাজে লাগায়। খাল কাটিয়া এক জায়গার জল আরেক জায়গায় নিতেও ইহারা কম ওস্তাদ নয়। এই-সমস্ত কাজে ইহাদের প্রধান অস্ত্র বাটালির মতো ধারাল চারটি দাঁত। বড়ো-বড়ো গাছ, যাহা কোপাইয়া কাটিতে মানুষের রীতিমতো পরিশ্রম লাগে, বীভার তাহার ঐ দাঁত দুটি দিয়া সেই গাছকে কুরিয়া মাটিতে ফেলে। যেখানে বীভারেরা পল্লী বাঁধিয়া দলবলে বসতি করে, তাহার আশেপাশেই দেখা যায় যে অনেকগুলি গাছের গোড়ার দিকে, জমি হইতে হাতখানেক উপরে, খানিকটা কাঠ যেন খাবলাইয়া ফেলা হইয়াছে। এক-একটা গাছ প্রায় পড়ো পড়ো অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে; আরেকটু কাটলেই পড়িয়া যাইবে। এ-সমস্তই বীভারের কাণ্ড। গাছটি যখন কাটা হইল তখন তাহাকে ছোটো-বড়ো নানারকম টুকরায় কাটিবার জন্য বীভারের দল ভারি ব্যস্ত হইয়া উঠে। শীতকালে যখন বরফ জমিয়া যায়, যখন চলাফিরা করিয়া খাবার সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়ে, তখন বীভারের প্রধান খাদ্য হয় গাছের ছাল। সেইজন্য শীত আসিবার পূর্বেই তাহাদের গাছ কাটিবার ধুম পড়িয়া যায়, এবং তাহারা গাছের নরম বাকল কাটিয়া বাসার মধ্যে জমাইতে থাকে।

বীভারের প্রধান আশ্চর্য কীর্তি নদীর বাঁধ; কিন্তু তাহার কথা বলিবার আগে ইহাদের বাসা সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। জলের ধারে কাঠকুটা ও মাটির ঢিপি বানাইয়া তাহার মধ্যে বীভারেরা স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া বাস করে। এই অদ্ভুত বাসায় ঢুকিবার দরজাটি থাকে জলের নীচে, একটা লম্বা প্যাঁচালো সুড়ঙ্গের মুখে। জলে ডুব মারিয়া ঐ সুড়ঙ্গের মুখটি বাহির করিতে না পারিলে বাসায় ঢুকিবার আর কোনো উপায় নাই। বাসার উপরে যে ঢিপির মতো ছাদ থাকে, তাহাও দু-তিন হাত বা তাহার চাইতে বেশি পুরু এবং খুবই মজবুত। এক-একটা ঢিপি প্রায় পাঁচ, সাত বা দশ হাত উঁচু হয়।

শীত পড়িবার কিছু আগেই তাহারা বাসায় ঢুকিবার একটা নূতন সুড়ঙ্গপথ কাটিতে

আরম্ভ করে। এই পথটা একেবারে সোজা আর খুব মোটা হয়—কারণ এইখান দিয়াই তাহারা গাছের ডালপালা আনিয়া শীতকালের জন্য সঞ্চয় করিতে থাকে। এই সুড়ঙ্গেরও মুখটি থাকে জলের নীচে। প্রত্যেক পরিবারের লোকেরা আপন আপন বাসায় ঢুকিবার পথ জানে এবং প্রত্যেক পরিবার নিজের নিজের খাবার সংগ্রহ করে। কেবল বড়ো-বড়ো বাঁধ বাঁধিবার সময়ে দুটি-চারটি বা আট-দশটি পরিবার একত্র হইয়া কাজ করে। মেজের উপর পাতিবার জন্য প্রত্যেক বাসায় কিছু কিছু নরম ঘাসও রাখা হয়। কোনো কোনো জায়গায় আবার বাসার মধ্যে দেয়াল তুলিয়া ছোটোদের ঘর, বড়োদের ঘর ইত্যাদি নানারকম আলগা ঘরের ব্যবস্থা করা হয়। আবার কোথাও কোথাও দোতলা তিনতলা করিয়াও ঘরের ব্যবস্থা করা হয়। খাবার সংগ্রহ হইয়া গেলে অনেক সময়ে বড়ো সুড়ঙ্গটার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। শীতকালে যখন জলের উপরে বরফ জমিয়া যায় সেই সময়ে বাহির হইবার জন্য একটা আলগা সুড়ঙ্গের দরকার হয়। এই সুড়ঙ্গটা থাকে বাসার বাহিরে—ইহার এক মুখ জলের নীচে, আরেক মুখ উঁচু ডাঙার উপরে। জলের নীচে বাসার দরজা দিয়া বাহির হইয়া তার পর এই সুড়ঙ্গের ভিতরে ঢুকিয়া তবে বীভারেরা বাহিরে আসে।

বীভারের শরীরের গঠন দেখিলেই বোঝা যায় যে জলে থাকা অভ্যাস তাহার আছে। হাঁসের পায়ের মতো চ্যাটালো পা, নৌকার বৈঠার মতো চওড়া চ্যাপ্‌টা ল্যাজ, গায়ের নরম লোমের উপরে আবার লম্বা তেলতেলা লোমের ঢাকনি—এ-সমস্তই জলজন্তুর উপযোগী ব্যবস্থা। বাসার কাছে জল না হইলে তাহাদের চলে না, সুতরাং সেখানে যাহাতে বারো মাস যথেষ্ট জল থাকে তাহার জন্য সে নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া জল আটকাইয়া বড়ো-বড়ো বিল জমাইয়া ফেলে। আর সেই বিলের ধারে বাসা বাঁধিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে। কোথাও বসতি করিবার আগে বীভারেরা দল বাঁধিয়া জায়গা দেখিতে বাহির হয়। যেখানে নদী আছে অথচ স্রোত বেশি নাই, অথবা জল খুব গভীর নয়, সেইরকম জায়গা তাহাদের খুব পছন্দ। জলের ধারে গাছ থাকা চাই আর জায়গাটা বেশ নির্জন চাই, তবেই তাহা ষোলো-আনা মনের মতো হয়! দলের মধ্যে যাহারা বয়সে প্রবীণ তাহারা প্রথমত চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া জায়গা ঠিক করে; তার পর সকলে মিলিয়া নদীর ধারের আঠালো মাটি আর ছোটো-বড়ো লাক্‌ড়ি ফেলিয়া জলের মধ্যে বাঁধ বাঁধিতে থাকে। এক পরত মাটি দিয়া তাহার উপর এক সার লাক্‌ড়ি চাপায়; তাহার উপরে আবার মাটি ফেলিয়া, তাহার উপর ডালপালা শিকড় জড়াইয়া মজবুত করিয়া গাঁথিয়া তোলে। বাঁধ যতই উঁচু হইতে থাকে, নদীর স্রোত বাধা পাইয়া ততই দুইদিকে ছড়াইয়া পড়ে—আর বীভারেরাও সেই বুঝিয়া বাঁধটাকে ক্রমাগতই লম্বা করিতে থাকে। এমনি করিয়া দেখিতে দেখিতে নদীর মধ্যে প্রকাণ্ড বিল জমিয়া যায়। অনেক সময় জলের বেগ কমাইবার জন্য কাছে কাছে আরো দু-একটা ছোটোখাটো বাঁধ দেওয়ার দরকার হয়। এ কাজটিও বীভারেরা খুব হিসাবমতো বুদ্ধি খাটাইয়া করে।

এ-সমস্ত কাজ করিতে হইলে—জলের স্রোত কোনদিকে, কোথায় কতখানি জল ইত্যাদি অনেক বিষয় জানা দরকার; কানাডার এক এঞ্জিনিয়ার সাহেব একটা নদীতে তিন-চারটি বীভারের বাঁধ পরীক্ষা করিয়া দেখেন। তিনি বলেন যে, তাঁহার উপর ও কাজের ভার থাকিলে তিনি যেখানে যেখানে যেরকম ভাবে বাঁধ রাখা উচিত বোধ করিতেন, বীভারেরাও

ঠিক সেই-সব জায়গায় তেমনিভাবে বাঁধ বসাইয়াছে। এইরকম এক-একটি বাঁধ এক-এক সময়ে একশো বা দুইশো হাত লম্বা এবং পাঁচ হাত বা দশ হাত উঁচু হইতে দেখা যায়। একবার এক সাহেব তামাশা দেখিবার জন্য রাত্রে একটা বাঁধের খানিকটা কোদাল দিয়া ভাঙিয়া লুকাইয়া থাকেন। ভাঙা বাঁধের ফাঁক দিয়া হড়্ হড়্ করিয়া জল বাহির হইতে লাগিল—তাহার শব্দে কোথা হইতে একটা বীভার বাহির হইয়া আসিল—তার পর দেখিতে দেখিতে আট-দশটি বীভার অতি সাবধানে এদিক-ওদিক কান পাতিয়া আস্তে আস্তে বাঁধের কাছে আসিল। তার পর সবাই মিলিয়া খানিকক্ষণ কি যেন পরামর্শ করিয়া হঠাৎ সকলে ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে ছুটিয়া গেল এবং দু ঘণ্টার মধ্যেই কাঠ ও মাটি দিয়া বাঁধটাকে মেরামত করিয়া তুলিল। তার পর একটা বীভার তাহার ল্যাজ দিয়া জলের উপর চটাৎ করিয়া বাড়ি মারিতেই সকলে যে যার মতো কোথায় সরিয়া পড়িল আর সারারাত তাহাদের দেখাই গেল না। হঠাৎ ভয় পাইলে বা সকলকে সতর্ক করিতে হইলে বীভারেরা এইরূপ জলের উপর ল্যাজের বাড়ি মারিয়া শব্দ করে। নিস্তব্ধ রাত্রে এই শব্দ পিস্তলের আওয়াজের মতো শুনায় এবং অনেক সময়ে একটা আওয়াজের পর সকলের জলে ঝাঁপ দিবার চটাপট্ শব্দ অনেক দূর হইতে পরিষ্কার শুনিতে পাওয়া যায়। বাঁধ বাঁধিবার জন্য গাছের দরকার হয়। এই গাছ কাটিয়া বড়ো-বড়ো লাক্‌ড়ি বানাইয়া তাহা বহিয়া লওয়া খুবই পরিশ্রমের কাজ। সেইজন্য বীভারেরা এমন জায়গায় বাসা খোঁজে যাহার কাছে যথেষ্ট গাছ আছে। সেই গাছগুলিকে তাহারা দাঁত দিয়া এমনভাবে কাটে যে গাছগুলি পড়িবার সময় ঠিক নদী-মুখো হইয়া পড়ে। তখন তাহাকে কাটিয়া কুটিয়া অল্প পরিশ্রমেই জলে ভাসাইয়া লওয়া যায়, কিন্তু গাছগুলি যদি জল হইতে দূরে থাকে অথবা কাছের গাছগুলি যদি সব ফুরাইয়া যায় তাহা হইলে উপায় কি? তাহা হইলে বীভারেরা দস্তুরমতো খাল কাটিয়া সেই গাছ আনিবার সুবিধা করিয়া লয়। তাহারা নদীর কিনারা হইতে গাছের গোড়া পর্যন্ত দু হাত চওড়া ও দু হাত গভীর একটি খাল কাটিয়া যায়। তার পর সেই খালে যখন নদীর জল আসিয়া পড়ে, তখন গাছের টুকরাগুলি তাহাতে ভাসাইয়া ঠেলিয়া লইতে আর কোনোই মুশকিল হয় না।

এমন যে বুদ্ধিমান নিরীহ জন্তু, মানুষে তাহার উপরেও অত্যাচার করিতে ছাড়ে নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে, বীভারের গায়ের চামড়াটি বড়োই সুন্দর ও মোলায়েম—শৌখিন লোকের লোভ হইবার মতো জিনিস। সুতরাং এই জন্তুকে মারিয়া তাহার চামড়া বিক্রয় করিলে বেশ দু পয়সা লাভ করা যায়। এই চামড়ার লোভে বিস্তর শিকারী আজ প্রায় দেড়শো বৎসর ধরিয়া নানা দেশে ইহাদের মারিয়া উজাড় করিয়া ফিরিতেছে। মানুষের শখের জন্য কত লক্ষ লক্ষ বীভার যে প্রাণ দিয়াছে তাহার আর সংখ্যা হয় না। এখনো যে ইহারা পৃথিবী হইতে লোপ পায় নাই, ইহাই আশ্চর্য।

বীভারের কথা বলিয়াছি কিন্তু বুদ্ধিমান জীবের কথা বলিতে গেলে আর-একটি জন্তুর কথা-বলিতে হয় তাহার নাম গ্লাটন। চুরি-বিদ্যায় ফাঁকি-বিদ্যায় খাওয়া-বিদ্যায় এবং নানা-রকম ধূর্ত-বিদ্যায় ইনি একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। শীতের দেশে যাহারা নানারকম দামী চামড়া সংগ্রহের জন্য বীভার প্রভৃতি জন্তু মারিয়া ফেরে, তাহারা এই গ্লাটনকে যেমন ভয় করে, এমন আর কাহাকেও নয়। এই গ্লাটন যেখানে দেখা দেয় সেখানে শিকারীর ব্যবসা মাটি। কত কৌশলে কত কষ্ট করিয়া শিকারীরা ফাঁদ পাতে আর গ্লাটন আসিয়া ফাঁদে পড়া জন্তু-গুলিকে খাইয়া সব ফাঁদ নষ্ট করিয়া চলিয়া যায়। সে নিজে কখনো ফাঁদে পড়িবে না, কিন্তু ফাঁদ নষ্ট করিতে তাহার মতো ওস্তাদ আর নাই। যখনি দেখা যায় ফাঁদগুলিকে টানিয়া ঘাঁটিয়া সব লণ্ডভণ্ড করা হইয়াছে, তখনি শিকারীরা বুঝিতে পারে গ্লাটন আসিয়াছে। এই গ্লাটনকে না মারা পর্যন্ত শিকারীর আর নিস্তার নাই। সে যতদিন থাকিবে ততদিন ফাঁদের সমস্ত শিকার খালি তাহারই পেটে যাইবে। ফাঁদকে সে গ্রাহ্য করে না, কারণ ফাঁদের মর্ম সে ভালো করিয়াই জানে। সে খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফাঁদ বাহির করে আর ফাঁদের সূতা কাটিয়া স্প্রিং সরাইয়া কাঠি নড়াইয়া তাহাকে একেবারে নষ্ট করিয়া রাখে। সুতরাং শিকারীরা অনেক সময়েই সে স্থান ছাড়িয়া বহু দূরে গিয়া আবার নূতন করিয়া ফাঁদ পাতিতে বাধ্য হয়। তাহাতেও সকল সময়ে নিস্তার নাই; কারণ শিকারীর ফাঁদ হইতে শিকার চুরি করিয়া খাইবার সহজ সুযোগটা ইহারা ছাড়িতে চায় না। তাই একবার কোনো শিকারীর সন্ধান পাইলে ইহারা তাহার সঙ্গ ছাড়িতে চায় না, গোপনে তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে চেষ্টা করে।

একবার একটা গ্লাটন প্রায় একমাস ধরিয়া এক শিকারীকে এইরকম জ্বালাতন করিয়া-ছিল। শিকারী প্রতিদিন পশমী নেউল ধরিবার জন্য ঝোপের মধ্যে দশ-বিশটা করিয়া ফাঁদ পাতিয়া রাখিত, আর প্রতিদিনই আসিয়া দেখিত চারিদিকে গ্লাটনের পায়ের দাগ আর ফাঁদ-গুলি ভাঙা। তাহাতে দু-চারটি শিকার যাহা ধরা গিয়াছিল তাহাদের কিছু কিছু টুকরা মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। নানারকম কায়দা করিয়া নানারকম নূতন ফাঁদ বসাইয়াও সেই একই-রকম ব্যাপার চলিতে লাগিল। তখন শিকারী নেউল ছাড়িয়া গ্লাটন ধরিবার ফাঁদ বসাইল। একটা ঝোপের মধ্যে দরজার মতো খানিকটা ফাঁক, তাহার পিছনে একটা কাঠির আগায় মাংস গাঁথা। সেই মাংস খাইতে গেলেই কাঠিতে টান পড়ে আর স্প্রিং ছুটিয়া আপনা হইতেই দরজা আটকাইয়া যায়। কিন্তু গ্লাটন তাহাতে ভুলিবার পাত্র নয়। দরজাটি দেখিয়াই সে আর সে-মুখো হয় নাই—সে ঘুরিয়া ঝোপের পিছন দিক হইতে কাঠ সরাইয়া কাঠিসুদ্ধ মাংসটাকে বাহির করিয়া খাইয়া ফেলিল। তার পর শিকারী খোলা বরফের উপর এক-টুকরা মাংস বসাইয়া তাহার সঙ্গে খানিকটা সূতা দিয়া একটা বন্দুক এমন কৌশলে আটকাইয়া দিলেন যে মাংসটাকে খাইতে গেলেই সূতায় টান পড়িয়া বন্দুক ছুটিয়া যায়। বন্দুকটা একটা

গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকানো। পরের দিন শিকারী গিয়া দেখে যে মাংসের চারিদিকে গ্লাটনের পায়ের দাগ, কিন্তু সে মাংসটুকু ছোঁয় নাই। শিকারী আরো বেশি মাংস দিয়া ভাবিল, অমন পেটুক জন্তু কি আর মাংসের লোভ বেশীক্ষণ সামলাইতে পারে? পরদিন সকালে দেখা গেল মাংসও খাইয়াছে, বন্দুকও ছুটিয়াছে কিন্তু গ্লাটন মরে নাই। সে গাছের গুঁড়ির আড়ালে থাকিয়া সূতা টানিয়া ছিঁড়িয়াছে। তাহাতে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া বোধ হয় সে ভয় পাইয়া পলাইয়াছিল কিন্তু পায়ের দাগ দেখিয়া বোঝা যায় যে সে পরে আবার আসিয়া মাংসটা খাইয়া গিয়াছে। তখন শিকারীর জেদ চড়িয়া গেল। সে ভাবিল যেমন করিয়া হউক এই হতভাগাটাকে মারিতেই হইবে। এই ভাবিয়া সে মাটিতে মাংস রাখিয়া জ্যোৎস্নারাত্রে বন্দুক হাতে করিয়া একটা গাছের উপর বসিয়া রহিল। কিন্তু সে রাত্রে আর গ্লাটনের দেখাই পাওয়া গেল না। শীতের রাত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া শিকারী যখন তাহার কাঠের তাবুতে ফিরিয়া আসিল, তখন সে দেখিল যে তাঁবুর জিনিসপত্র সব উলটপালট, আর অনেক জিনিস চুরি হইয়া গিয়াছে। তাঁবুর বাহিরে কেবল গ্লাটনের পায়ের দাগ। তার পর অনেক কষ্টে চারিদিকে নানা স্থান হইতে চোরাই জিনিস সব সংগ্রহ করিয়া শিকারী সেই যে সেখান হইতে একেবারে সরিয়া পড়িল, ত্রিশ মাইল পথ পার না হইয়া আর নূতন ফাঁদ পাতিল না।

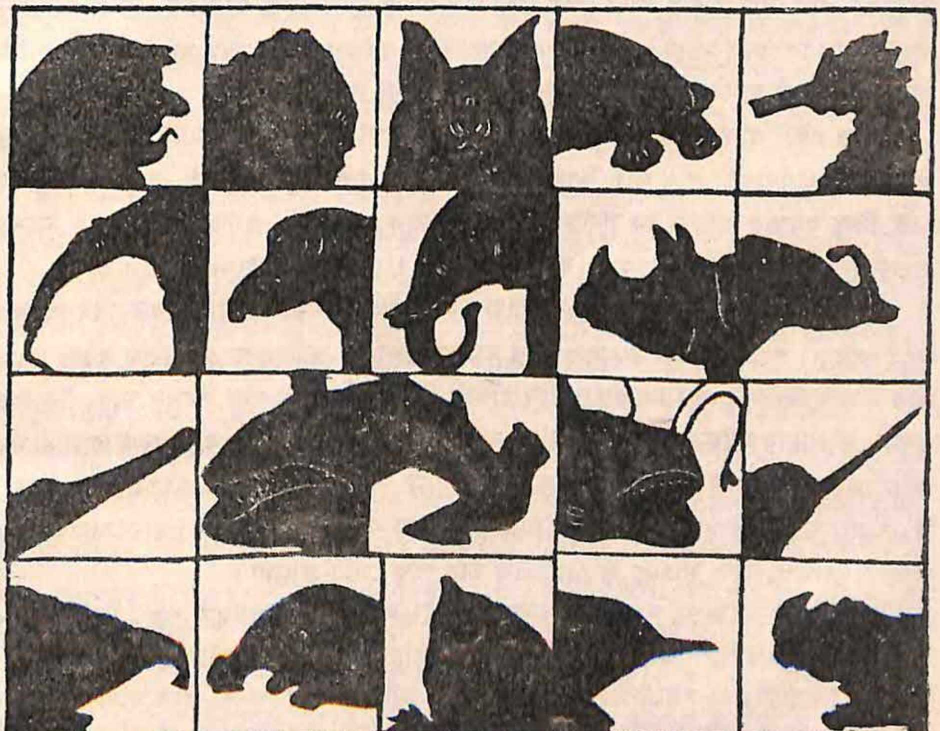
গ্লাটনের নামে এই দুটি মস্ত অপবাদ—সে চোর এবং পেটুক। সে যে পেটুক তাহার আর অন্য প্রমাণ দরকার নাই—এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে ইংরাজিতে 'গ্লাটন' (Glutton) কথাটার অর্থই হয় পেটুক। দেখিতে কতকটা শেয়ালের মতো, চেহারাটাও তাহার চাইতে বড়ো নয়; কিন্তু সে যে পরিমাণ আহার করে তাহাতে একটা বাঘেরও বেশ পরিতোষ করিয়া নিমন্ত্রণ খাওয়া চলে। আর চোর হওয়ার কথাটা তো আগেই শুনিয়াছ। সে যে কিরকম চোর তাহা চুরির নমুনাতেই বোঝা যায়। যে জিনিস সে খায় না, যাহার ব্যবহার সে জানে না এবং যে জিনিসে তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, এমন সব জিনিসও সে সুযোগ পাইলেই সরাইয়া ফেলে। ছাতা জুতা টুথব্রাশ কাগজ কলম হইতে আরম্ভ করিয়া হাঁড়িকুড়ি-ঘটিবাটি বা উনানের লোহার শিক পর্যন্ত চুরি করিতে সে ইতস্তত করে না।

গ্লাটনের আর-একটি অভ্যাস আছে, সেও কম অদ্ভুত নয়। হঠাৎ মানুষ বা অপরিচিত জন্তুকে দেখিলে সে খাড়া হইয়া দুই পায়ের উপর ভর দিয়া বসে এবং সামনের পা দুখানা চোখের উপরে এমনভাবে উঠাইয়া ধরে যে দেখিলে মনে হয় ঠিক যেন ভালো করিয়া পরখ করিবার জন্য চোখটাকে আড়াল দিয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরকম বুদ্ধি আর এই-সব অদ্ভুত রকম-সকম দেখিয়া সেদেশের লোকে অনেক সময়ে ভয় পায়—তাহারা বলে এই জন্তুটার চাল-চলন কেমন ভূতের কাণ্ড বলিয়া মনে হয়।

নরওয়ে দেশে ভালুক বা নেকড়ে বাঘ মারিতে পারিলে যে পুরস্কার পাওয়া যায়, গ্লাটন মারিলেও ঠিক সেই পুরস্কার। ইহাতে বুঝিতে পার যে এই ছোটো জন্তুটির অত্যাচারকে মানুষে কিরকম ভয় করে।

নাকের বাহার

মানুষের নাকের প্রশংসা করতে হলে তিল ফুলের সঙ্গে, টিয়া পাখির ঠোঁটের সঙ্গে গরুড়ের নাকের সঙ্গে তার তুলনা করে। কেউ কেউ আবার বলেন শুনেছি, 'বাঁশির মতো নাক'। কিন্তু মোটের উপর এ কথা বলা যায় যে, সকলের নাকেরই মোটামুটি ছাঁদটি সেই একঘেয়ে রকমের ; দো-নলা সুড়ঙ্গের মতো। কারও নলদুটি সরু কারও বা মোটা, কারও চ্যাপটা, কারও উঁচু—কারও মাঝখানে ঢালু, কারও আগাগোড়াই ঢিপি—এইরকম সামান্য উনিশ-বিশ যা একটু তফাত হয়। কারও কারও নাক যদি হাতির শুঁড়ের মতো লম্বা হত কি গণ্ডারের মতো খড়্গধারী হত, অথবা আর কোনো উদ্ভট জানোয়ারের মতো হত, তা হলে বেশ একটু রকমারি হতে পারত। সে রকমারি যে বড়ো সামান্য নয় তাই বোঝাবার জন্য এখানে কতক গুলি জানোয়ারের চেহারা দেখানো হল।'এদের প্রায় সকলকেই বোধহয় তোমরা চেন।



হাতির শুঁড়টাই যে তার নাক তোমরা নিশ্চয়ই জান। হাতির পাশেই যে জন্তুটির নাম করা যায়, তার নাম টেপির ; এর নাকটিও শুঁড় হতে চেয়েছিল, কিন্তু বেশি দূর এগোতে পারে নি। তার পাশেই দেখ পিঁপড়ে-খোরের ছবি এরও একটা শুঁড় আছে কিন্তু সেটা শুধু নাক নয়, নাকমুখ দুই মিলে লম্বা হয়ে ওরকম হয়ে গেছে। কুমিরেরও ঠিক তাই। আর

উপরের ডানদিকে যে চোঙামুখ জন্তুটি দেখছ, তার পরিচয়ও তোমরা পেয়েছ (সমুদ্রের ঘোড়া') নীচের দুরকমের ছুঁচো আছে, তার একটির বেশ স্পষ্টরকম শুঁড় গজিয়েছে, আর-একটি কেবল শুঁড়ে সন্তুষ্ট নয়, তার নাকের আগাটি হয়েছে ঠিক ফুলের মতো এই শৌখিন ছুঁচোটির গায়ের গন্ধ কিন্তু ফুলের মতো একেবারেই নয়। তার চেয়ে জমকাল নাকের কথা যদি বলতে হয় তবে পুষ্পনাসা বাদুড়ের কথাটা নিতান্তই বলা উচিত। পর্দার পর পর্দা গোলাপফুলের পাপড়ির মতো সাজিয়ে তার উপরে যেন তিলক চন্দন এঁকে নাকটিকে তৈরি করা হয়েছে। এত ঘটা করে নাকের বাহার ফোটাবার উদ্দেশ্যটা কি, মুখের 'সৌন্দর্য' বাড়ানো না শত্রুকে ভয় দেখানো তা আমি জানি না।

পুষ্পনাসার এক পাশে হাসচঞ্চু, তার নাকমুখ হাঁসের ঠোঁটের মতো চ্যাপটা। আর একপাশে ম্যান্‌ড্রিল বাঁদর। শুধু এই ছবি দেখে যদি বিচার কর, তবে এর উপর নিতান্তই অবিচার হবে ; কারণ এর রঙটিই হচ্ছে এর আসল বাহার। টকটকে লাল নাক, তার দু-পাশে নীলরঙের ঢিব্‌লি, তার উপর চমৎকার কারুকার্য—যারা কলকাতায় আছে তারা চিড়িয়াখানায় গেলেই একবার স্বচক্ষে দেখে আসতে পার। ম্যানড্রিলের পাশে নাকেশ্বর বানর। এর নাক সম্বন্ধে আর বেশি কথা বলবার দরকার নেই, ছবিতেই দেখছ কেমন ছোটোখাটো বেগুনের মতো নাকটি। বাঁদরের খাঁদা নাকের দুর্নাম সকলেই করে, কিন্তু এই নাকটি খাঁদা না হলেও তাতে তার সুনাম বাড়বে কিনা সন্দেহ।

ব্যাঙ যখন হাতির উপর রাগ করে বলেছিল "বড়ো যে ডিঙোলি মোরে"—তখন হাতি তাকে "থ্যাব্‌ড়ানাকী" বলে গাল দিয়েছিল। হাতির গালটা খুব লাগসই হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু ব্যাঙের বংশেও যে সকলেরই থ্যাব্‌ড়া নাক, তা নয়। এমন ব্যাঙও আছে যাদের নাকটি চড়াই পাখির ঠোঁটের মতো দিব্যি চোখালো। (নীচের লাইনের মাঝের ছবি)

কোনো কোনো জন্তু আবার শুধু নাকটাকে নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। তারা নাকের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র জুড়ে বেড়ায়। গণ্ডারের খড়্গটি থাকে তার নাকের উপরে। আফ্রিকায় একরকম বরাহ আছে তার নাম বাবিরুসা, তার নাকের দুপাশে চামড়া ফুঁড়ে দুই জোড়া দাঁত শিঙের মতো উঁচু হয়ে থাকে। তলোয়ার মাছের নাকের ডগায় যে অস্ত্রটি বসানো থাকে তাতে বাস্তবিকই তলোয়ারের কাজ হয়। করাতি মাছের তলোয়ারটির গায়ে আবার করাতের মতো কাটা থাকে। বঁড়শিবাজ মাছের কথা শুনেছ--তারা নাকের আগায় বাঁকা ছিপের মতো লম্বা নোলক ঝুলিয়ে রাখে। উদ্দেশ্য, অন্য মাছকে ভুলিয়ে এনে তার ঘাড় ভেঙে খাওয়া।

কোনো কোনো জন্তুর নাকটা যে কোথায় সেটা হঠাৎ খুঁজে পাওয়াই শক্ত। তিমি মাছের মাথার উপর যেখানে তার চোখ থাকবার সম্ভাবনা মনে হয় সেখানে তার নাক থাকে। কাঁটালো গিরগিটির গা-ভরা উবড়ো খাবড়ো শিঙের মতো কাঁটার ঝোপ—তার মধ্যে তার নাক মুখ চোখ অনেক সময়েই বেমালুম লুকিয়ে থাকে। আর হাতুড়িমুখো হাঙরের চেহারা তো আগাগোড়াই উলটোরকম। একটা দুমুখো হাতুড়ির মতো তার মাথা, সেই হাতুড়ির দুই মাথায় দুটি চোখ। আর নাকটা হচ্ছে হাতুড়ির মাঝামাঝি—হাতুড়ির ডাণ্ডাটা যেখানে বসানো থাকে সেইখানে।

এখন তোমরা বল, এর মধ্যে কার নাকের বাহার বেশি।'

নিশাচর

নিশাচর বলে তাদের যারা রাত জেগে চলাফেরা করে, অর্থাৎ আহার খোঁজে। নিশাচর জন্তুদের মধ্যে একটির নাম তোমরা সকলেই বলতে পারবে, সেটি হচ্ছে 'প্যাঁচা'।

নিশাচরেরা রাত্রে আহার করে কেন ? তার নানা কারণ আছে। প্রথমত যারা শত্রুর ভয়ে দিনের আলোতে বেরুতে সাহস পায় না, রাত্রে অন্ধকারে তাদের গা ঢাকা দিয়ে চলবার সুবিধা হয়। যেমন আফ্রিকার 'কাকাপো' অথবা 'প্যাঁচাটিয়া'। এদের ডানা ছোটো বলে ভালো করে উড়তে পারে না ; দিনের বেলা বেরোলেই অন্য পাখিরা ঠুকরিয়ে অস্থির করে তোলে। ইঁদুর জাতীয় নানারকম নিরীহ জন্তু আছে, তারাও একরকম শত্রুর ভয়ে সারাদিন লুকিয়ে থাকে, রাত্রে শিকারের খোঁজে বেরোয়।

কোনো কোনো জন্তু আছে তাদের শরীরের গঠন এমন যে তারা দিনের আলো, রোদ বা গরম সইতে পারে না। প্যাঁচার চোখ এমন অদ্ভুত যে সে আলোর দিকে ভালো করে তাকাতেই পারে না, সহজেই চোখ ঝল্‌সে যায়। সাপ ব্যাঙ প্রভৃতি যে-সব জন্তুর রক্ত ঠাণ্ডা, তারা রোদে বেরোলে শরীরের রস শুকিয়ে যায়। তাই তারা সারাদিন ঝোপে জঙ্গলে ছায়ার মধ্যে থাকতে চায়।

আর একদল নিশাচর আছে, যারা রাত্রে বেরোয় ভালোরকম শিকার জোটে বলে। বাঘ সিংহ প্রভৃতি বড়ো-মাংস-খোর জন্তুরা এই কারণেই অনেক সময় নিশাচর হয়। সন্ধ্যার পর নানারকম পোকামাকড় বেরোয় তাই পোকা-খোর জন্তুরাও এ সময়ই খাবার আশায় ঘুরে বেড়ায়। সন্ধ্যার সময় যে চামচিকারা বা 'নাকাটি' পাখিরা ব্যস্ত হয়ে আকাশময় ছুটাছুটি করে, সেটাও তাদের ভোজের আনন্দ। ভালো করে দেখলেই বোঝা যায় যে তারা উড়তে উড়তে পোকা ফড়িং খেয়ে বেড়াচ্ছে।

'লেমার' বা ক্ষুদে বানরদেরও অনেকেই এই দলের মধ্যে পড়ে। তারাও রাত হলেই পোকামাকড় খুঁজে বেড়ায়। রাত্রে আলোর কাছে টিকটিকির পোকা শিকারের উৎসাহ তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। রাত্রে আলো দেখে যত পোকা এসে জড়ো হয় দিনের বেলায় একসঙ্গে তত পোকা পাওয়া শক্ত। টিকটিকির ভোজটাও তাই সন্ধ্যার পরে জমে ভালো।

নিশাচর জন্তুদের প্রায় সকলের মধ্যেই একটি অভ্যাস দেখা যায়—সেটি হচ্ছে নিঃশব্দে চলা। প্যাঁচার শরীরটি তো নেহাত ছোটো নয়, সে উড়তেও পারে বেশ ; অথচ উড়বার সময় তার ডানা ঝাপটের শব্দ শুনতে পাওয়া যায় না। রাত্রে অন্ধকারে দেখতে হয় বলে তাদের চোখ দুটোও তেমনি করে তৈরি। প্রায়ই দেখা যায় নিশাচর জন্তুদের চোখ প্যাঁচার মতো বড়ো আর গোল গোল হয়। সেইজন্য অনেক সময় তাদের দেখতেও অদ্ভুত দেখায়। যে-সব ক্ষুদে বানরদের কথা আগে বলেছি, তাদেরও চোখ মুখ আর চলাফেরা এমন অদ্ভুত গোচের হয় যে দেখলে অনেক সময় ভয় হয়। আরেকরকম বানর আছে, তার নাম 'টার্সীয়ের'। যেদেশে এর বাড়ি সেখানকার লোকেরা একে 'ভুত বানর' বলে। এর সমস্ত

কপালজোড়া বড়ো-বড়ো চোখ, আর রোগা রোগা কাঠির মতো হাত-পা। গাছের আড়াল থেকে হঠাৎ উঁকি মেরেই রবারের মতো নিঃশব্দে লাফ দিয়ে আবার দশ হাত দূর থেকে উঁকি মারা—এই হচ্ছে এর চাল-চলনের ধরন। কারও কোনো অনিষ্ট করে না, কেবল পোকামাকড় খেয়ে থাকে অথচ লোকে মিছামিছি তাকে ভূতের মতো ভয় করে। তার একটা কারণ সে নিশাচর।

আমাদের পুরাণে রাক্ষসদের নামও নিশাচর। তারাও নাকি দিনের আলোর চাইতে রাত্রের অন্ধকারটাই বেশি পছন্দ করে। আর চোর ডাকাত যারা পরের বাড়িতে সিঁদ কেটে ঘুমন্ত মানুষের সর্বনাশ করে, তাদেরও 'শিকার' করবার সুবিধা হয় রাত্রে! আজকালকার সভ্য মানুষ রাতকে দিন করে রাখে। রাত্রেও হাজার আলো জ্বালিয়ে দিয়ে তার কলকারখানা, রেল, স্টিমার চালাতে হয়। সুতরাং মাঝে মাঝে ভদ্র মানুষকেও কাজকর্মের জন্য নিশাচর হতে হয়। ভোরবেলা যে খবরের কাগজটি পড়, তার জন্যে যে কত লোকের রাত জেগে খাটতে হয় তা কখনো ভেবে দেখেছ কি? আর রেলে স্টিমারে ড্রাইভার গার্ড প্রভৃতি কত-জনকে যে দিনের পর দিন রাতমজুরি খাটতে হয়, তারাও একরকম নিশাচর বৈকি!

বেবুন

যে-সব বানরের মুখ কুকুরের মতো লম্বাটে, যারা চার পায়ে চলে, যাদের ল্যাজ বেঁটে আর গালের মধ্যে থলি আর পিছনের দিকটায় কাঁচা মাংসের মতো ঢিপি, তাদের নাম বেবুন। বেবুনের আসল বাড়ি আফ্রিকায়, কেউ কেউ এশিয়াতেও থাকেন। বেবুন বংশের অনেক শাখা—হলদে বেবুন, লালমুখো বেবুন, ঝুঁটিওয়ালা কালো বেবুন, চিত্রমুখ সং-বেবুন বা ম্যানড্রিল, চাকমা বেবুন, ড্রিল বেবুন ইত্যাদি। কিন্তু সকলেরই মুখের ভঙ্গি চাল-চলন ও স্বভাব প্রায় একইরকম। উঁচু উঁচু ধারালো দাঁত, বদ্‌খত মেজাজ আর তার চাইতেও বদ্‌খত চেহারা। সমস্ত জানোয়ারদের মধ্যে বিদঘুটে চেহারা যদি কারও থাকে তবে সে ঐ ম্যান-ড্রিলের। টকটকে লাল নাক, খাঁজকাঁটা নীল গাল, ভেংচিকাটা ভ্রূকুটি মুখ, সব মিলে অপূর্ব চেহারাখানা হয়!

আফ্রিকার পাহাড়ে জঙ্গলে বেবুনেরা দল বেঁধে লুকিয়ে থাকে। বল, বুদ্ধি, ভরসা, এই তিন জিনিসের জোরে সে নীচের জমিতে নেমে এসে চাষার ক্ষেতের উপর অত্যাচার করে ফল শস্য খেয়ে পালায়। তাদের দল বাঁধবার কায়দা, আর পথঘাট পাহারা দেবার ব্যবস্থা এমন চমৎকার, আর এমন হঠাৎ এসে লুটপাট করে তারা ফস্ করে পালায় যে, চাষারা তাদের সঙ্গে কিছুতেই পেরে ওঠে না। পালাবার সময় বেবুনেরা কখনো দলের কাউকে ফেলে যায় না—যদি একজন বিপদে পড়ে অমনি পালের গোদারা তাকে সাহায্য করবার জন্য তেড়ে আসে। একবার একটা বাচ্চা বেবুনকে কতগুলো কুকুরে ঘেরাও করে ফেলেছিল, কিন্তু একটা ধাড়ি বেবুন এসে সেই কুকুরের দলের মধ্যে ঢুকে, এমনি দু-তিন ভেংচি দিয়ে তাদের

মুখের সামনে থেকেই সেই বাচ্চাটাকে কেড়ে নিয়ে গেল যেন, কুকুরগুলো ভয়ে কিছুই করতে সাহস পেল না—দূরে শিকারীরা পর্যন্ত তার তেজ দেখে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

বিপদে পড়লে বেবুনেরা পিছনের পায়ে ভর করে খাড়া হয়ে বসে—শত্রুকে হাতের কাছে পেলেই নখ দিয়ে খাম্‌চে টেনে মুখের কাছে নিয়ে এসে, তার পরেই প্রচণ্ড এক কামড়। কামড়ের জোরে হাড়গোড় পর্যন্ত অনায়াসেই গুঁড়িয়ে দিতে পারে। নখ দাঁতই হচ্ছে বেবুনের প্রধান অস্ত্র—কিন্তু দরকার হলে তারা পাথর ছুঁড়তেও জানে। বড়ো-বড়ো পাথর গড়িয়ে শত্রুর মাথায় ফেলতে তারা খুব ওস্তাদ।

সিংহ শিকার

আফ্রিকা হল সিংহের দেশ, ইউরোপ আমেরিকার বড়ো-বড়ো শিকারীরা সেখানে বন্দুক নিয়ে দলেবলে সিংহ শিকার করতে যান। তাঁরা মনে করেন, যতরকম শিকার আছে তার মধ্যে সিংহ শিকার খুব একটা বড়ো ব্যাপার; কারণ তাতে শিকারীর সাহস এবং বাহাদুরির পরিচয়টা ভালো করেই পাওয়া যায়। যে শিকারী সিংহ মেরেছে লোকে তাকে ওস্তাদ শিকারী বলে মানে। সিংহ শিকারের বিপদ খুব বেশি। আজকাল বন্দুকের এত যে উন্নতি হয়েছে, তবুও এখনো কত শিকারী সিংহের হাতে প্রাণ হারান। তিন-চারটা সাংঘাতিক গুলি খাবার পরেও একশো গজ দৌড়ে এসে সিংহ তার শিকারীকে শিকার করেছে, এমন ঘটনার কথাও শোনা যায়। তার মধ্যে একটি গুলি সিংহের হৃৎপিণ্ড ফুটো করে বেরিয়ে গিয়েছিল, তবু মরবার আগে সে তার মরণকামড়টি না দিয়ে ছাড়ে নি। তা হলে ভাব সিংহ কি জিনিস!

এমন যে সিংহ তাকে আফ্রিকার 'মাসাই' ও 'নান্দি' জাতের নিগ্রোরা বল্লম দিয়ে শিকার করে থাকে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি এবং অসাধারণ মনস্বী লোক বলে সকল দেশে পরিচিত, কিন্তু শিকারী হিসাবেও তাঁর প্রতিপত্তি বড়ো কম নয়। তিনি নান্দিদের সিংহ শিকার স্বচক্ষে দেখে তার যে বর্ণনা লিখে গিয়েছেন, তা পড়লে অবাক হতে হয়।

নান্দিদের শিকার দেখবার জন্য তিনি একদিন আফ্রিকার জঙ্গলে দলেবলে সিংহের খোঁজে বেরিয়েছিলেন। কথা ছিল, সিংহ পাওয়া গেলে নান্দিরা শিকার করবে; সাহেবরা কেউ সে শিকারে যোগ দেবেন না, কিছু বলতে পারবেন না; তাঁরা কেবল দূরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখবেন। ঝোপ জঙ্গল ঘেঁটে অনেক খোঁজার পর প্রকাণ্ড এক সিংহ পাওয়া গেল। তেমন সিংহ সচরাচর মেলে না। রুজভেল্ট লিখেছেন, সিংহটাকে দেখে তাঁদের শিকার করবার লোভ জেগে উঠছিল, কিন্তু তা হলে তাঁদের কথা রক্ষা হয় না, আর নান্দিদের শিকারটাও দেখা হয় না; তাই তাঁরা দলেবলে সিংহটাকে ঘিরে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। নান্দিরা একটু পিছনে পড়েছিল, দেখতে দেখতে তারা এসে

হাজির হল। এক হাতে বল্লম, আর এক হাতে ঢাল—বিশাল দেহটি যেন কালো পাথরে তৈরি মুখে দয়ামায়া দ্বিধা ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। সিংহ পাওয়া গিয়েছে শুনে তাদের আনন্দ দেখে কে? তারা এক-এক পা চলে আর এক-একটি বিরাট লাফ দেয়। দেখতে দেখতে সিংহের ঝোপটিকে তারা নিঃশব্দে ঘেরাও করে ফেলল।

সিংহটাও এতক্ষণ চুপ করে ছিল না। সে ঝোপের আড়ালে বসে ছিল, আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। দেখল কতগুলো মানুষ তার দিকে এগিয়ে আসছে। তারা সব ঢালের আড়ালে গুঁড়ি মেরে বল্লম বাগিয়ে দাঁড়াচ্ছে। এক-একটি ঢালের উপর দিয়ে এক-এক জোড়া কালো চোখ যমের ভ্রূকুট্টির মতো তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে বেশ বুঝল যে তার জন্যই এত সব আয়োজন, তার গর্জনে সারা জঙ্গল কেঁপে উঠতে লাগল। তার ঘাড়ের কেশর খাড়া হয়ে দাঁড়ালো, তার মুখখানা ভীষণভাবে বিকৃত হয়ে গেল, তার ল্যাজের বাড়িতে সমস্ত ঝোপটা চঞ্চল হয়ে উঠল। সে একবার এপাশ ফিরল একবার ওপাশ ফিরল, ডাইনে তাকাল বাঁয়ে তাকাল, কোনদিকে লোক কম দেখে তার পর তীরের মতো সেইদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

একটি লোকও সেদিক থেকে সরলো না। সব ঢাল বাগিয়ে বল্লম তুলে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো! দুপাশ থেকে শিকারীরা বল্লম হাতে দৌড়ে এল, দলের যে নেতা সে লাফ দিয়ে দৌড়ে সকলের সামনে গিয়ে পড়ল। তার হাত থেকে বল্লমখানি বিদ্যুতের মতো ছুটে গিয়ে সিংহের গায়ের মধ্যে বিঁধে গেল। সিংহটাও আঘাত লাগামাত্র তার সামনে যাকে পেল তাকেই আক্রমণ করে ধরল। সে লোকটাও তার জন্য প্রস্তুত ছিল, তার বল্লমের এক ঘায়ে সে চক্ষের নিমেষে সিংহটাকে একেবারে এপার ওপার ফুঁড়ে ফেলল—একদিকের ঘাড়ের মধ্যে ঢুকে বল্লমের আগাটা অন্য দিকে পেটের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সিংহটা তার ঢালের উপর দিয়ে প্রচণ্ড এক থাবা মেরে, তার ঘাড়ের মধ্যে নখ দাঁত বসিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলল। আর অমনি চার দিক থেকে বল্লমের পর বল্লম আগুনের ঝলকের মতো ছুটে এসে সিংহটাকে একেবারে অস্ত্রে অস্ত্রে গেঁথে ফেলল। এর মধ্যেও কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে আরো একটি শিকারীকে জখম করতে ছাড়ে নি। মরবার সময় একটা বল্লমকে সে এমন জোরে কামড়িয়ে ধরেছিল যে, লোহার বল্লমটা উলটে মুচড়ে বঁড়শির মতো বেঁকে গিয়েছিল। তার পর নান্দিদের উল্লাস দেখে কে! খানিকক্ষণ পর্যন্ত সিংহের চারি দিকে তাদের চীৎকার আর বিজয় নৃত্যের ঘটা চলল। সুখের বিষয়, আহত শিকারী দুজনেই বেঁচে উঠেছিল।

সিংহের তেড়ে-আসা থেকে এত কাণ্ড শেষ হওয়া পর্যন্ত দশ সেকেণ্ডও সময় লাগে নি। সিংহের আক্রমণ, শিকারীর অস্ত্র বৃষ্টি, আঁচড় কামড় হুড়াহুড়ি আঘাত যন্ত্রণা ও মৃত্যু, ওর মধ্যেই সব এক ঝাপটায় শেষ! সিংহটা যখন পড়ল, তখন তার অবস্থাটি হয়েছিল ঠিক ভীষ্মের শরশয্যার মতো।

আলিপুরের বাগানে

আলিপুরের চিড়িয়াখানায় আমাদের একটি বন্ধু আছেন। আমরা যখনই আলিপুর যাই অন্তত একটিবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ভুলি না। দেখা করবার সময় শুধু হাতে যাওয়াটা ভালো নয়, তাই বন্ধুর জন্য প্রায়ই কিছু উপহার নিয়ে যাই। তিনিও তাঁর সাধ্যমত নানারকম তামাশা কসরত ও মুখভঙ্গী দেখিয়ে আমাদের আপ্যায়িত করেন।

অনেকে চিড়িয়াখানায় গিয়ে গোড়া থেকেই বাঘের ঘরটা দেখ্‌বার জন্য ব্যস্ত হন। সাপ, কুমির, উটপাখি, গণ্ডার আর হিপোপটেমাস—কেউ কেউ এঁদেরও খুব খাতির করে থাকেন। কিন্তু যে যাই বলো বাগানে ঢুকতে না ঢুকতেই আমাদের মনটা সকলের আগে বলতে থাকে, বন্ধুর বাড়ি চল্, বন্ধুর বাড়ি চল্। বন্ধুর সঙ্গে কেন যে আমাদের এত ভাব, তা যদি শুনতে চাও, তা হলে তাঁর নামের পরিচয়, গুণের পরিচয়, বিদ্যার পরিচয়, সব তোমাদের শুনতে হয়।

বন্ধুটির নাম হচ্ছে শ্রীযুক্ত ওরাংচন্দ্র ওটান। আফ্রিকা নিবাসী, আলিপুর প্রবাসী। অমন অমায়িক চেহারা, অমন ঢিলাঢালা প্রশান্ত স্বভাব অমন ধীর গম্ভীর মেজাজী চাল, সমস্ত আলিপুর খুঁজে আর কোথাও দেখবে না।

কত যে ভাবনা আর কত যে হিসাবপত্র সর্বদা তাঁর মাথার মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছে, তাঁর ঐ প্রকাণ্ড কপালজোড়া হিজিবিজি রেখাগুলো দেখলেই তা বুঝতে পারবে। যখন তিনি চিৎপাত হয়ে শুয়ে, মুখের মধ্যে আঙুল দিয়ে, পেট চুলকাতে থাকেন, আর তাঁর কালো কালো হ্যাংলা মতন চোখ-দুটি মিট্‌মিট্ করে তাকিয়ে থাকে, তখন যদি তাঁর মনের মধ্যে কান পেতে শুনতে পারতে, তা হলে শুনতে সেখানে অনর্গল হিসাব চলছে—'আর চারটে কলা, আর দু ঠোঙা বাদাম আর কতগুলো বিস্কুট, আর ঐ নাম-জানি না গোল-গোল-মতন অনেকখানি' —ইত্যাদি। যখন তিনি খাঁচার ছাত থেকে গরাদ ধরে অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো ঝুলতে থাকেন আর দুলতে থাকেন—যেন সংসারের কোনো কিছুতে তাঁর মন নেই—তখন যদি তাঁর মনের কথা শুনতে, তা হলে শুনতে পেতে, তিনি কেবলই ভাবছেন, কেবলই ভাবছেন, 'এই লোকটার পাগড়ি নাহয় ঐ লোকটার চাদর, নাহয় এই সাহেবটার টুপি, নাহয় ঐ বাবুটার ছাতা—নেবই নেব, নেবই নেব।'

একদিন আমরা চিড়িয়াখানায় গিয়ে দেখি, ওরাংবাবু দোলনা বেঁধে দোল খাচ্ছেন। কোত্থেকে কি করে, কার একটা পাগড়ি তিনি আদায় করেছেন, আর সেইটাকে ছাতের গরাদের উপর থেকে ঝুলিয়ে অপূর্ব দোলনা তৈরি হয়েছে। তিনি দুহাতে তার দুই মাথা ধরে মনের আনন্দে দুলছেন। তাঁর মুখখানা যেন সদানন্দ শিশুর মতো, নিজের বাহাদুরি দেখে নিজেই অবাক।

হঠাৎ তাঁর কি খেয়াল হল, পাগড়ির একটা দিক ছেড়ে দিয়ে তিনি গেলেন মাথা চুলকোতে। অমনি পাগড়ির একটা মাথা ভারী হয়ে নেমে পড়ল, আর আরেক মাথা আলগা পেয়ে সুড়ুৎ করে গরাদের উপর দিয়ে পিছলে বেরিয়ে এল। ব্যাপারখানা বুঝবার আগেই ওরাংবাবু

মেঝের উপর চিৎপাত। আর কেউ হলে অপ্রস্তুত হত, কিন্তু বন্ধু আমাদের অপ্রস্তুত হবার পাত্রই নন। তিনি পড়েই একটা ডিগবাজি খেয়ে উঠলেন আর এমনভাবে ফিরে দাঁড়ালেন যেন আগাগোড়া তিনি ইচ্ছা করেই আমাদের তামাশা দেখাচ্ছিলেন। তার পর অনেকখানি ভেবে আর অনেক বুদ্ধি খরচ করে আবার তিনি দোলনা খাটালেন। কাপড়টাকে গরাদের উপর দিয়ে গলিয়ে তার দুটো মাথাকেই যে ধরে রাখতে হয়, এটা বুঝতে তাঁর কিছুক্ষণ সময় লেগেছিল। তিনি পাগড়িটাকে ঝুলিয়ে এক মাথা ধরে টানেন, আর হুস্ করে দোলনা খুলে আসে, তাতে প্রথমটা বেচারার ভারি ভাবনা হয়েছিল।

আমাদের বন্ধুটির নানারকম বিদ্যা আছে। তিনি পান খেতে ভারি ভালোবাসেন। পানটা হাতে দিলে, আগে সেটাকে খুলে পরীক্ষা করে দেখেন, তার পর হাতের মুঠোর মধ্যে মুড়ে টপ্ করে মুখের মধ্যে দিয়ে ফেলেন। যখন পান খেয়ে তাঁর মুখখানা লাল হয়, আর গাল বেয়ে পানের রস পড়তে থাকে, তখন তিনি মাটির মধ্যে থুতু ফেলেন, আর লাল রঙের থুতু দেখে খুশি হয়ে তাকিয়ে থাকেন। একদিন গিয়ে দেখি, তিনি জবাফুলের মালা গলায় দিয়ে অত্যন্ত লাজুক ছেলের মতো চুপচাপ করে বসে আছেন। আমাদের দেখে তাঁর কি খেয়াল হল জানি না তিনি ফুলগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেললেন। শুনেছি, তিনি নাকি লুকিয়ে সিগারেট খেতেও শিখেছেন, আর সুযোগ পেলে মালীদের হুঁকোতেও দু-এক টান দিতে ছাড়েন না!

বন্ধু গান-বাজনার সমজদার কিনা, অথবা 'সন্দেশ' পড়তে পারেন কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ পাই নি, কিন্তু তিনি যে সুগন্ধ জিনিসের কদর বোঝেন তার পরিচয় অনেক পেয়েছি। তুলোয় করে খানিকটা এসেন্স দিয়ে দেখেছি, সেই তুলোটুকু নাকে ঠেকিয়ে শুঁকতে শুঁকতে আরামে তাঁর দুই চোখ বুজে আসে, জোরে জোরে নিশ্বাস টানতে টানতে, তিনি চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়েন। অনেকক্ষণ শুঁকে শুঁকে তার পর তুলোটাকে যত্ন করে তুলে রেখে দেন, আর থেকে থেকে ফিরে এসে তার গন্ধ শোঁকেন। একবার আমরা তামাশা দেখবার জন্য তুলোয় করে খানিকটা ঝাঁঝালো আমোনিয়া দিয়েছিলাম। সেটাকে শুঁকে যেরকম অদ্ভুত চোখমুখের ভঙ্গি তিনি করেছিলেন, আর যেরকম করে বার-বার হাতে আর রেলিঙে নাক ঘষেছিলেন সে কথা মনে হলে আজও আমাদের হাসি পায়। একবার শুঁকেও তাঁর কৌতূহল মেটে নি, খুব সাবধানে দূর থেকে আরো দু-চার বার তুলোটাকে শুঁকে, আর দু-চারবার চমৎকার মুখভঙ্গি করে, তিনি সেটাকে তাঁর প্রতিবেশী এক বেবুনের ঘরের মধ্যে ফেলে দিলেন। সেই হতভাগা বেবুনটাও কথা নেই বার্তা নেই, তুলোটুকু নিয়েই ঝপ্ করে মুখে দিয়ে ফেলেছে। তার পর যদি তার দুরবস্থা দেখতে! অনেকক্ষণ পর্যন্ত নাক রগড়িয়ে হাঁচতে হাঁচতে, আর হাঁ করে জিভের জল ফেলতে ফেলতে বেচারা অস্থির।

এই বেবুনটার সঙ্গে ওরাং ওটানের একটুও ভাব নেই। আরেকবার ওরাং আমাদের কাছ থেকে একটা লাঠি আদায় করেছিলেন লাঠিটা পেয়েই তিনি ব্যস্তভাবে বাইরে গিয়ে, রেলিঙের ফাঁক দিয়ে তাঁর নিশ্চিন্ত প্রতিবেশীর ঘাড়ের উপর এক খোঁচা। তখন যদি বেবুনের রাগ দেখতে! আমরা সেবার দুই খাঁচার মাঝখানে কলা গুঁজে দিয়ে, বেবুন আর ওরাঙের

ঝগড়া দেখেছিলাম। বোকা বেবুনটা যতক্ষণে আঁচড় কামড় আর কিল ঘুঁষি চালাতে থাকে, ততক্ষণে ওরাংবাবু গম্ভীরভাবে ঘাড় গুঁজে কলাটুকু বার করে নেন। কলাটি নিয়ে মুখে দিয়ে তার পর উল্লাস আর ভেংচি। বেবুনটা রাগে যতই পাগলের মতো হয়ে উঠতে থাকে, বন্ধুর ততই ফুর্তি বাড়ে।

এ-সব কথা কিন্তু চুপিচুপি খালি তোমাদের কাছেই বললাম। তোমরা আলিপুরের কর্তাদের কাছে কক্ষনো এ-সব বোলো না; তা হলে আমাদের বাগানে যাওয়া মুশকিল হবে।

খাঁচার বাইরে খাঁচার জন্তু

বনের জন্তুকে ধরে যখন খাঁচায় পোরা হয় তখন তার যে কিরকম দুরবস্থা হয়, সেটা বেশ সহজেই বুঝতে পারি। কিন্তু খাঁচার জন্তু যখন হঠাৎ ছাড়া পেয়ে বাইরে এসে পড়ে তখন তার দুরবস্থাটিও এক-এক সময়ে বড়ো কম হয় না।

লণ্ডনের এক চিড়িয়াখানার একটা রেলিং দেওয়া বাগান-করা জমির মধ্যে কতগুলি হরিণ থাকত। সেই ছোট্টো জমিটুকুর মধ্যে নতুন ঘর তৈরি হবে, তাই মজুরেরা সেখানে কাঠের তক্তা এনে ফেলেছিল। একদিন একটা হরিণ সেই রাশি-করা কাঠের উপর চড়ে হঠাৎ কেমন করে এক লাফ দিয়ে রেলিঙের বাইরে গিয়ে পড়েছে। হরিণ পালাচ্ছে দেখে চিড়িয়াখানার লোকেরা সব ব্যস্ত হয়ে ছুটে এল, কিন্তু হরিণ বেচারা ব্যস্ত হল তাদের চাইতে আরো অনেকখানি বেশি। যখন সে বুঝতে পারল যে রেলিঙের মধ্যে ফিরে যাবার আর কোনো উপায় নেই, তখন সে কোথায় যাবে ঠিক করতে না পেরে পাগলের মতো চিড়িয়াখানার বাগানময় কেবল ছুটোছুটি করতে লাগল। হরিণের দৌড় দেখে বাগানের যত জন্তু সবাই যেন ব্যস্ত হয়ে উঠল। বাঘ সিংহ উঠে দাঁড়ালো, হরিণেরা বড়ো-বড়ো চোখ মেলে যে যার ঘরে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল। আর বাঁদরগুলো রেলিঙে চোখ ঠেকিয়ে চেঁচাতে লাগল আর রেলিং ধরে ঝাঁকাতে লাগল। অনেক হাঙ্গামের পর, শেষটায় সেই ঘেরা জমির দরজাটা খুলে দিয়ে হরিণটাকে সেইদিকে তাড়া করে নিতে, তখন সে নিজের পরিচিত আশ্রয়ে ঢুকে তার পর শান্ত হল।

এক টিয়াপাখির গল্প পড়েছিলাম; এক বাজিওয়ালার কাছে সে নানারকমের বোলচাল শিখেছিল। যখন তামাশা দেখবার জন্যে দলে দলে লোক এসে বাজিওয়ালার তাঁবুর ধারে ভিড় করত আর ঢুকবার জন্য ঠেলাঠেলি করত, তখন টিয়াপাখিটা চীৎকার করে বলত— "আস্তে! আস্তে! ঢের জায়গা আছে! মশায়রা অত ভিড় করবেন না।" একদিন টিয়াপাখির কি দুর্মতি হল, সে খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে উড়ে পালাল। কিন্তু পালাবে আর কোথায়? একে তো বেচরার উড়বার অভ্যাস নেই, তার উপর খাঁচায় থেকে খাঁচাটার উপরেও কেমন মায়া হয়ে গেছে। তাই দু-একদিন এদিক-ওদিক লুকিয়ে থেকে সে আবার ঘুরে ফিরে সেই তাঁবুর কাছেই একটা গাছে এসে বসল। বাজিওয়ালা ততক্ষণে তাকে খুঁজে

খুঁজে শেষটায় তার আশা ছেড়ে দিয়ে বসেছে। এমন সময়ে উপরে ভারি একটা হৈ চৈ গোলমাল শুনে বাজিওয়ালা বেরিয়ে এসে দেখল যে গাছের উপর টিয়াপাখি বসে আছে আর যত রাজ্যের পাখি এসে তার চারদিকে গোলমাল করে, তাকে ঠুকরিয়ে আর পালক ছিঁড়ে অস্থির করে তুলেছে। টিয়াপাখি বেচারা ব্যাপার দেখে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে, আর ক্রমাগত বলছে—"আস্তে! আস্তে! ঢের জায়গা আছে! মশায়রা অত ভিড় করবেন না।" তখন বাজিওয়ালা খাঁচাটা এনে খুলে ধরতেই বেচারা তাড়াতাড়ি তার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

পাখি বা হরিণ বা কোনো নিরীহ জন্তু না হয়ে যদি বাঘ বা সিংহের মতো হিংস্র জন্তু এইরকম ভাবে ছাড়া পেত তা হলে ব্যাপারটা কিরকম হত? হাঙ্গেরীর বুদাপেস্ত শহরে একবার একটা সিংহ সার্কাসওয়ালার খাঁচা থেকে কেমন করে বেরিয়ে পড়েছিল! সিংহ বেরিয়ে পড়েছে দেখে সার্কাসের লোকেরা হৈ চৈ করে গোলমাল করে উঠতেই সিংহ বেচারা থতমত খেয়ে একেবারে সার্কাসের জমি পার হয়ে সড়ক পার হয়ে পাঁচিল টপ্‌কিয়ে এক খোলা ময়দানের মধ্যে গিয়ে হাজির। সেটা ছিল ছেলেদের খেলার মাঠ—তারা সেখানে বল খেলছে, ছুটছে, লাফাচ্ছে, হুড়োহুড়ি করছে। সিংহ বেচারার তো চক্ষুস্থির, সে এরকম কাণ্ড আর কখনো দেখে নি। কোথায় আর যায়, সে অপ্রস্তুত হয়ে চুপচাপ সরে পড়বার চেষ্টা করছে এমন সময়ে পাঁচিল টপকিয়ে সিংহওয়ালা স্বয়ং এসে হাজির। সিংহ তখন ভিড়ের মধ্যে চেনা মুখ দেখে আশ্বস্ত হল, আর পোষা বেড়ালটির মতো তার মালিকের সঙ্গে আস্তে আস্তে খাঁচায় ফিরে চলল।

আর-এক বার আমেরিকার জানোয়ারওয়ালা বোস্টক সাহেবের এক সিংহ খাঁচা থেকে পালিয়েছিল। শহরের রাস্তায় বেরিয়েই সে দেখে চার দিকে লোকজন, গাড়ি-ঘোড়া চলাচল করছে, নিরিবিলি বসবার জায়গা কোথাও নেই। তাই দেখে পশুরাজের মেজাজ গেল খারাপ হয়ে, তিনি গোঁসা করে এক পুরানো ড্রেনের মধ্যে গিয়ে যে ঢুকলেন, আর কিছুতেই বেরোতে চান না। কুকুর লেলিয়ে, বন্দুক ছুটিয়ে, নানারকমে খোঁচাখুঁচি করেও কিছুতেই তাকে হটানো গেল না। এমন সময়ে হঠাৎ কার হাত থেকে একটা টিনের বালতি ঝন্‌ঝন্ করে গিয়েছে ড্রেনের মধ্যে পড়ে। সেই শব্দ শুনে চমকে উঠে পশুরাজ এক দৌড়ে একেবারে তাঁর খাঁচার মধ্যে! কারণ, খাঁচার মতো নিরাপদ জায়গা আর নেই।

লড়াইবাজ জানোয়ার

এক-একজন মানুষ থাকে—কেবল সকলের সঙ্গে ঝগড়া বাধানো হচ্ছে তাদের স্বভাব। কথায় কথায় যেমন তাদের মুখ চলে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে হাতও চলে। জানোয়ারদের মধ্যেও এইরকম বদমেজাজী জীবের অভাব নাই। যে-সব বড়ো-বড়ো জন্তুরা পেটের দায়ে অন্য জন্তু শিকার করে বেড়ায়, আমরা তাদের বলি শ্বাপদ জন্তু, হিংস্র জন্তু। কিন্তু মানুষ যখন

নিরীহ ছাগল ভেড়া বা হাঁস মোরগের গলায় ছুরি মেরে তাদের মাংস কেটে খায় তখন আমাদের মনেই হয় না যে আমরাও ঐ হিংস্র জন্তুর দলে। জানোয়ারদের মতো সাংঘাতিক নখ দাঁত বা শিং আমাদের না থাকতে পারে কিন্তু তার বদলে যে-সব ধারালো অস্ত্র আমরা ব্যবহার করি তাতে আমাদের হিংসা-বৃত্তির পরিচয়টা খুব ভালোরকমেই পাওয়া যায়।

জানোয়ারদের মধ্যে যারা আমিষভোজী, অন্য জন্তুর মাংস না খেলে যাদের চলে না তারাই যে কেবল হিংস্র হয় তাও নয়। যারা নিরামিষ খায়, যেমন হাতি, গণ্ডার, বুনো মহিষ বা বরাহ—তাদের মেজাজও সব সময় নিরীহ তপস্বীদের মতো হয় না। আর সে মেজাজ বিগড়ালে বেশ বোঝা যায় যে সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারে তারাও কম ওস্তাদ নয়। মহিষের শিং, বরাহের দাঁত, গণ্ডারের খড়্গ অস্ত্র হিসাবে এগুলি কোনোটাই বড়ো কম নয়। হাতিরও দাঁত আছে—কিন্তু তার চাইতে তার ঐ গোদা পায়ের চাপুনিটাই বোধ হয় বেশি মারাত্মক।

ছোটোখাটো জন্তুদের আমরা হিংস্র জন্তু বলে বড়ো—একটা গ্রাহ্য করি না, কারণ তাদের দিয়ে আমাদের বিশেষ কোনো অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু তাদের সমান জন্তুদের কাছে তারাও বড়ো কম ভয়ানক নয়। এমন যে নিরীহ কাঠবেড়ালী, যে সারাদিন অন্য জন্তুর ভয়ে ভয়ে থাকে, কোথাও একটু শব্দ পেলেই চমকিয়ে ছুটে পালায়, ছোটো-ছোটো পাখির বাসায় ডিমের সন্ধান পেলে সেও একজন রীতিমতো অত্যাচারী হয়ে উঠতে জানে! হঠাৎ তাড়া খেলে বা ভয় পেলে ইঁদুর বা ছুঁচোর মতো ছোটো জন্তুও বেশ মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। সেরকম অবস্থায় তারা মানুষকেও কামড়াতে ছাড়ে না। আর সে কামড়ও বড়ো সামান্য নয়। ছুঁচোর কামড় খেয়ে মানুষকে কখনো কখনো মাসের পর মাস জ্বরে ভুগতে দেখা গিয়েছে।

কিছুদিন আগে এক সাহেব সাইকেল চড়ে বিলাতের এক পাড়াগেঁয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। সন্ধ্যার সময় পথের মাঝে নেমে তিনি সাইকেলের আলো জ্বালাচ্ছেন, এমন সময় ছোট্টো একটা বিলাতী বেজি ঘুরতে ঘুরতে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত। সাহেবের কি খেয়াল হল, তিনি রাস্তা থেকে একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে বেজিটার গায়ে ছুঁড়ে মারলেন। মারতেই বেজিটা অদ্ভুত কিচ্‌কিচ্ শব্দ করে উঠল; আর তাই শুনে কোত্থেকে বারো-চোদ্দোটা বেজি এসে একসঙ্গে সাহেবকে আক্রমণ করে বসল। তারা ক্রমাগত লাফ দিয়ে সাহেবের গলার টুঁটি কামড়ে ধরবার চেষ্টা করতে লাগল। সাহেব একটুক্ষণ আত্মরক্ষার চেষ্টা করে তার পর প্রাণের ভয়ে সাইকেল চড়ে সেখান থেকে চম্পট দিলেন। বেজিগুলো তবু প্রায় দেড়মাইল পথ সাইকেলের পিছন পিছন তাড়া করে এসেছিল। হঠাৎ কি করে যে বেজিদের এতখানি তেজ আর সাহস হয়ে উঠল তার কোনো কারণ পাওয়া যায় না; কারণ, সাধারণত তারা মানুষের শব্দ পেলেই ছুটে পালায়।

বেজিগুলো ইচ্ছা করলে খুব সহজেই সাহেবের পা কামড়াতে পারত, কিন্তু তা না করে তারা গলায় টুঁটির দিকেই বার বার তেড়ে উঠছিল, যেন তারা জানে যে ঐখানে কামড়ালে জখমটা হবে সাংঘাতিক। এরকম প্রায়ই দেখা যায় যে শিকারী জন্তুরা অন্য জন্তু মারবার সময় তাকে এমনভাবে মারে যাতে সে সহজেই কাবু হয়। 'হেজহগ,' (Hedgehog) বা

কাঁটাচুয়ার সারা গায়ে কাঁটা, তার গায়ে কোথাও কামড় দেবার জো নেই ; কিন্তু তার গলার নীচটাতে কাঁটা নাই, সেখানে কামড় দিলে বেচারা আর আত্মরক্ষা করতে পারে না। ইঁদুরেরা তাই সুযোগ বুঝে তার গলায় কামড় বসাবার চেষ্টা করে ; ভুলেও কখনো পিঠের উপর কামড় দিতে যায় না। বেজি যখন সাপের সঙ্গে লড়াই করে তখন তার দৃষ্টি থাকে সাপের ঘাড়ের কাছে, ঠিক ফণাটির পিছনে ; সেখানে কামড় দিয়ে ধরলে সাপ আর উলটে ছোবল মারতে পারে না।

ছোটো-ছোটো পোকামাকড়েরা পর্যন্ত এই-সব সংকেত জানে। তোমরা বোলতা আর মাকড়সার লড়াই দেখেছ ? সে এক অদ্ভুত জিনিস। মাকড়সা জানে যে বোলতার একটি কামড় খেলে তার আর রক্ষা নাই, তাই সে কেবলই জালের আড়াল দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। সেই জালের ভিতর থেকে সবগুলি পা একসঙ্গে বার করে সে বোলতাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে, কিন্তু কখনো তেড়ে গিয়ে আক্রমণ করবার সাহস পায় না। বোলতাও বার বার ভন্‌ভন্‌ করে জালের কাছ পর্যন্ত তেড়ে এসে আবার পালিয়ে যায়, কারণ সেও জানে যে ঐ জালের মধ্যে একবার আটকা পড়লে তার আর বের হবার উপায় নাই।

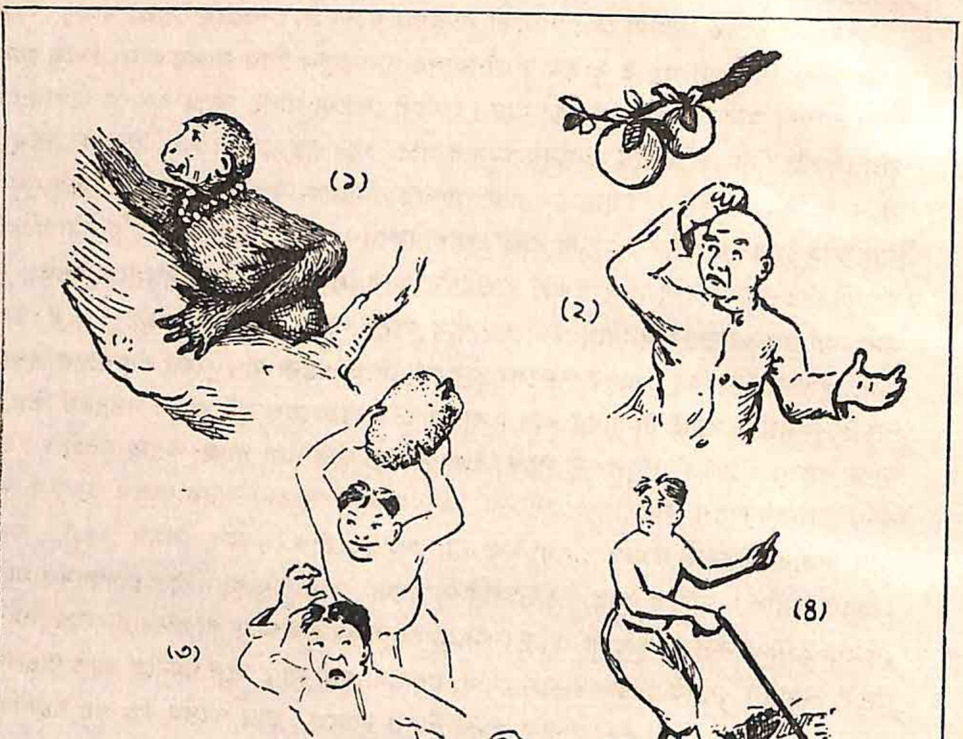
কেবল যে অন্য জন্তুদের সঙ্গেই জানোয়ারদের লড়াই বাধে, তা নয়। ছাগলের লড়াই বেড়ালের ঝগড়া কিম্বা কুকুরের কামড়াকামড়ি তোমরা সকলেই দেখেছ। কাগে কাগে কিম্বা চড়াইয়ে চড়াইয়ে ঝগড়াও সর্বদাই দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের ঘরে একটা ধাড়ি টিকটিকি আছে, সন্ধ্যার পর দেয়ালের বাতির কাছে, যে-সব পোকা বসে সে তাদের ধরে ধরে খায়। অন্য টিকটিকিকে ঘরের ত্রিসীমানার মধ্যে আসতে দেখলে সে তাকে তাড়া করে যায়, পাছে সে এসে তার খাবারে ভাগ বসায়। খাবারের জন্যে জানোয়ারদের মধ্যে রেষারেষি তো চলেই, বিয়ের জন্যেও রেষারেষি চলে। মনে করো জঙ্গলে একজন পরমাসুন্দরী গণ্ডারনী আছেন আর দুটি ছোকরা গণ্ডার আছে, তাদের দুজনেরই তাঁকে ভারি পছন্দ। এখন উপায় ? উপায় হচ্ছে দস্তুরমতো লড়াই করে এর মীমাংসা করে নেওয়া। এরকম লড়াই হরিণদের মধ্যেও চলে, অন্যান্য অনেক জন্তুদের মধ্যেও চলে। পাখিদের মধ্যে তো খুবই চলে।

এ ছাড়া এমন অনেক জন্তু আছে যারা কেবল লড়াইয়ের খাতিরেই লড়ে। যে-সব দলছাড়া হাতি একলা একলা জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, তাদের স্বভাবটা অনেক সময়েই এইরকম হয়। বুনো বরাহদের স্বভাবটাও নাকি অনেকটা এই ধরনের। আর-এক রকম ভিমরুলের কথা আমি জানি, সে থাকে খাসিয়া পাহাড়ে, তার গায়ে ডোরা ডোরা দাগ ; তাকে কিছু না বললেও সে তেড়ে এসে বঁড়শির মতো হুল দিয়ে কামড় বসিয়ে দেয়। আমার মাথায় ভালো করে কামড়াতে পারে নি, তবু তিনদিন ব্যথার চোটে আমার ঘুমানো মুশকিল হয়েছিল।

মানুষমুখো

বাঁদরের মুখের চেহারা যে অনেকটা মানুষের মতো তা দেখলেই বোঝা যায় ; বিশেষত ওরাং ওটান শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি বুদ্ধিমান বাঁদরদের চাল-চলন আর মুখের ভাব দেখলে মানুষের মতো আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। কোনো কোনো বাঁদর আছে তাদের মাথায় লোম-গুলি দেখলে ঠিক টেরিকাটা মানুষের মাথার মতো মনে হয়, যেন কেউ চিরুনি দিয়ে চুল ফিরিয়ে সিঁথে কেটে দিয়েছে। এক ধরনের বাঁদরের যেরকম গোঁফের বাহার খুব কম মানুষেরই সেরকম আছে। তার বাড়ি আমেরিকায়। ছোট্টো আধ হাত উঁচু বাঁদরটি, কিন্তু ঐ গোঁফের জন্যে তার মুখে একটা গাম্ভীর্যের ভাব দেখা যায়। এদের রঙ কালো, হাতে লম্বা লম্বা নখ থাকে, তাই দিয়ে কাঠবেড়ালীর মতো গাছে খাম্‌চিয়ে ওঠে। এই জাতীয় বাঁদরের নাম টামারিন্। এদের সকলের এরকম গোঁফ থাকে না ; গুঁফো বাঁদরদের এম্পারার টামারিন্ অর্থাৎ সম্রাট টামারিন্ বলে। তা সম্রাটের মতো চেহারাই বটে। সম্রাটের প্রিয় খাদ্য হচ্ছে কলা। গুঁফো বাঁদরের পর দাড়িওয়ালা বাঁদর, তার নাম হচ্ছে কালো সাকী। তারও বাড়ি আমেরিকায়। সেদেশের লোকেরা এই বাঁদরকে শয়তান বাঁদর বলে। এরকম অন্যায় নাম দেবার কোনোই কারণ পাওয়া যায় না, কারণ এদের মেজাজ যেমন ঠাণ্ডা, স্বভাবও তেমনি নিরীহ। দাড়ির বহর যতই হোক-না কেন, আসলে এরা ভীতুর একশেষ। মানুষের কোনো অনিষ্ট করা দূরে থাক কাছে কোথাও মানুষ আছে জানতে পারলে এরা তার ত্রিসীমানা ছেড়ে পালায়। এদের কোনোরকমে পোষ মানানো যায় না ; ধরে আনলে অতি অল্প দিনের মধ্যে মরে যায়। আর-এক জাতের সাকী বাঁদর রয়েছে। তার গায়ের রঙ খুব হালকা তাই একে সাদা সাকী বলা হয়। তার চেহারা যেন আরো উদ্ভট গোছের। দাড়িও অন্য রকমের। এইরকমের গালপাট্টা দেওয়া চেহারা আর বিকট ধেবড়ানো মুখ দেখে বুঝবার জো নেই যে, বেচারার স্বভাবটি মোটেও তার চেহারার মতো নয়।

বুড়ো-ধাড়ী সিন্ধুঘোটকদের চেহারাও অনেক সময় খুব মাতব্বর গোছের মানুষের মতো মনে হয়। গোঁফ-দাড়ি, মাথায় টাক, সবই বেশ মানিয়ে যায়, কেবল হাতির মতো ঐ প্রকাণ্ড দাঁত দুটোতেই সব মাটি করে দেয়।



উপরের সাতটি প্রবাদ বাক্যের ছবি আঁকিয়া দেখানো হইয়াছে। প্রবাদগুলি বাহির কর।

টিয়াপাখির বুদ্ধি

এক ফরাসি ভদ্রলোকের একটা কুকুর আর একটা টিয়াপাখি ছিল। কুকুরটাকে তিনি নানারকম খেলা আর কাজ শিখিয়ে ছিলেন, 'বাইরে যাও', 'দোকানে যাও', 'খাবার আনো' বলে তিনি যখন যেমন হুকুম করতেন, কুকুরটা ঠিক মতন তাঁর হুকুম তামিল করত। টিয়াপাখিটা কিন্তু কিছু কাজ করতে শেখে নি। সে কেবল সব সময় বকর্ বকর্ করে কথা বলত আর কুকুরটার উপর সর্দারি করত। কুকুর বেচারা হয়তো ঘরের মধ্যে শুয়ে আছে হঠাৎ টিয়াপাখিটা চোখ পাকিয়ে ধমক দিয়ে বলল, "এইও বাইরে যাও"—কুকুরেরও হুকুম শুনে অভ্যাস—সে ভয়ে ভয়ে লেজ গুটিয়ে দরজার দিকে রওনা হত। তখন আবার টিয়াপাখিটা ঠিক তার মনিবের মতো শিস্ দিয়ে তাকে ডেকে আনত।

সেই ভদ্রলোকটি কুকুরটাকে প্রায়ই রুটিওয়ালার দোকানে 'কেক্' আনবার জন্য পাঠাতেন। কুকুরটাকে সকলেই খুবই চিনত সুতরাং সে টুকরি মুখে নিয়ে দোকানে আসলেই রুটি-ওয়ালা টুকরির মধ্যে কেক্ পুরে দিত আর তার মনিবের নামে হিসাব লিখে রাখত। একদিন ভদ্রলোকটি হিসাব করতে গিয়ে দেখেন যে তাঁর হিসাবের সঙ্গে দোকানের হিসাব মিলছে না! তিনি যতবার কুকুরটাকে পাঠিয়েছেন—দোকানীর হিসাব তার চাইতেও বেশি লেখা হয়েছে! কয়েক দিন পর্যন্ত এর কারণ কিছু বোঝা গেল না। তার পর তিনি একদিন দেখেন কি, কুকুরটা শুয়ে আছে এমন সময় টিয়াপাখিটা হঠাৎ বলে উঠল, "টুক্রি আনো।" কুকুরটা একটু উঠে টুক্রি নিয়ে এল। টিয়াপাখি বলল, "দোকানে যাও।" কুকুর বেচারা ইতস্তত করতে লাগল, তাই দেখে সে আবার চীৎকার করে বলল, "এইও, দোকানে যাও।" কুকুর বেচারা আর কি করে? সে দোকানে গিয়ে দু'মিনিটের মধ্যে খাবার এনে পাখিটার সামনে রেখে লেজ্ নাড়তে লাগল, ইচ্ছাটা সেও কিছু ভাগ পায়, কিন্তু টিয়াপাখি "বাইরে যাও" বলে এক ধমক দিয়ে তাকে তাড়িয়ে, নিজেই সবটা খাবার খেতে লাগল।

তখন ভদ্রলোকটি বুঝতে পারলেন যে দোকানীর হিসাবে কেন বেশি লেখা হয়।

ব্যাঙের সমুদ্র দেখা

গ্রামের ধারে কবেকার পুরানো এক পাতকুয়োর ফাটলের মধ্যে কোলাব্যাঙ তার পরিবার নিয়ে থাকত। গ্রামের মেয়েরা সেখানে জল তুলতে এসে যে-সব কথাবার্তা বলত কোলা-ব্যাঙ তার ছেলেদের সেই-সব কথা বুঝিয়ে দিত—আর ছেলেরা ভাবত 'ইস্! বাবা কত জানে!'

একদিন সেই মেয়েরা সমুদ্রের কথা বলতে লাগল। ব্যাঙের ছানারা জিজ্ঞাসা করল—"হ্যাঁ বাবা! সমুদ্র কাকে বলে?" ব্যাঙ খানিক ভেবে বলল, "সমুদ্র? সে একরকম জন্তর নাম।" তখন একটা ছানা বলল—"ওরা যে বলছিল সমুদ্র খুব ভয়ানক বড়ো হয়, আর তার মধ্যে অনেক অনেক জল থাকে—আর লোকেরা সাঁতার কেটে তা পার হতে পারে না!" তখন কোলাব্যাঙ মুশকিলে পড়ল। সে গাছপালা দেখেছে, বাড়িঘর দেখেছে, মানুষ কুকুর ঘটিবাটি নানারকম জিনিসপত্র সব দেখেছে, আর ছেলেবেলায় অনেকরকম জিনিসের গল্প শুনেছে। কিন্তু সমুদ্রের কথা তো কখনো শোনে নি! তখন সে ভাবল, সমুদ্রের কথা একটু খোঁজ করে দেখতে হবে।

পরদিন সকালে উঠেই কোলাব্যাঙ তার ছাতা পোঁট্‌লা নিয়ে বলল, "আমি সমুদ্রের সন্ধান করতে যাচ্ছি।" তার গিন্নী কত কাঁদল, ছেলেরা নানারকম সুর করে তাকে বারণ করল কিন্তু কোলাব্যাঙ বলল, "না, এতে আমার জ্ঞানলাভ হবে—তোমরা বাধা দিয়ো না।" এই বলে সে পাতকুয়ো থেকে উঠে একটা মাঠের দিকে চলল। ব্যাঙ বাইরে এসেই দেখল মানুষ কুকুর গোরু তারা কেউ তার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলে না—তাই দেখে সে ভাবল, 'লাফিয়ে চললে সবাই আমায় বেকুব ভাববে।' এই ভেবে সে হেঁটে হেঁটে চলতে লাগল। কিন্তু অমন করে চলে তো তার অভ্যাস নেই—খানিক দূর গিয়েই তার ভারি পরিশ্রম বোধ হল।

মাঠের ওপারে আর-এক গ্রামের কাছে এক গর্তের মধ্যে মেটে ব্যাঙদের বাসা ছিল। মেটে ব্যাঙেরাও সমুদ্রের কথা শুনেছে, তাই তাদের মধ্যে একজন বেরিয়েছে সমুদ্রটা দেখতে। মাঝপথে দুই ব্যাঙের দেখা হল। কোলাব্যাঙ বলল, "আমি ফাটলকুয়োর কোলাব্যাঙ, যাচ্ছি সমুদ্রে।" মেটে ব্যাঙ বলল, "আমি মেঠো-মাটির ব্যাঙ, আমিও যাচ্ছি সমুদ্রে।" তখন তাদের ভারি ফুর্তি হল।

কিন্তু সমুদ্রে যাবার পথ তো তারা জানে না। মাঠের মধ্যে একটা মস্ত টিপি ছিল; মেটে ব্যাঙ বলল, "ওর উপরে উঠে দেখি তো কিছু দেখা যায় কি না।"

এই বলে তারা অনেক কষ্টে সেই টিপির উপর চড়ে সেখান থেকে একটা গ্রাম দেখতে পেল। মেটে ব্যাঙ বলল, "আরে দূর ছাই! এরকম তো ঢের দেখেছি! আমার বাড়ির কাছেই তো অমন আছে।" কোলাব্যাঙ বলল, "তাই তো। আমিও ছেলেবেলা থেকে ওরকম কত দেখেছি। সব জায়গাই দেখছি একরকম। মিছামিছি আমরা হেঁটে মরলাম।"

তখন তারা ভারি বিরক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গেল। কোলাব্যাঙ তার ছানাদের বলল, "সমুদ্র-টমুদ্র কিছু নেই—ও-সব মিছে কথা!"

(জাপানী গল্প)

খুকির লড়াই দেখা

একদল ইংরেজ সৈন্য মাঠের পাশ দিয়ে লড়ায়ের জায়গায় যাচ্ছে, এমন সময় তাদের একজন হঠাৎ দেখতে পেল, মাঠের কিনারায় একটা খুকি ঘুমাচ্ছে! আশেপাশে কোথাও লোকজন নাই, ঘর বাড়ি যা কিছু ছিল কোন কালে গোলা লেগে ছাতু হয়ে গেছে—এমন জায়গায় খুকি আসল কোথা থেকে? খুকির বয়স বছর দুই, টুক্‌টুক করে হেঁটে বেড়ায়, অতি মিষ্টি ক'রে দু' চারটি কথা বলে ফরাসী ভাষায়। সে যে কোথা থেকে এল তা সে বুঝিয়ে বলতে পারে না। সৈন্যরা ঠিক করল, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া যাক, পরে খোঁজ করে যা হয় একটা করা যাবে। লড়াইয়ের জায়গায় মাটির মধ্যে খাদ কেটে সৈন্যরা সব সময় হুঁশিয়ার হয়ে বসে থাকে—কখনো একদিন, কখনো দুদিন কখনো বা সপ্তাহ ধরে এক-একদলে সেই খাদের মধ্যে থাকতে হয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে তারা খুকিকে নিয়েই আস্তে আস্তে খাদের মধ্যে ঢুকল।

সামনে জার্মানদের খাদ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক গোলা ফাটার শব্দ হচ্ছে, কখন-বা দুটো-একটা বন্দুকের গুলি সোঁ করে মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু খুকুমনির তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। সৈন্যরা তার জন্য খড় দিয়ে আর বালির বস্তা দিয়ে সুন্দর বিছানা করে দিয়েছে—তার মধ্যে সে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাচ্ছে! সকাল হতেই কামানের লড়াই আরম্ভ হল—প্রথমটা অল্প-স্বল্প—তার পরে ক্রমেই বেশি। খুকি তখন ঘুম থেকে উঠেছে, সে প্রথম প্রথম দুম্‌দাম্ শব্দে বোধ হয় একটু ভয় পেয়েছিল—কিন্তু খানিকক্ষণ শুনে শুনে আপনা হতেই তার ভয় ভেঙে গেল। সে তখন খাদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে আলাপ করতে লাগল, তাদের বন্দুক, দুরবীন অস্ত্র-শস্ত্র দেখিয়ে 'এটা কি?' 'ওটা কি?' জিজ্ঞাসা করতে লাগল।

তার পর একদিন যায়, দুদিন যায়, সৈন্যরা তখনো সেখান থেকে বদলি হয় নি। তিন দিনের দিন জার্মানরা খাদের উপর প্রকাণ্ড এক বোমা ফেলল। বোমা ভয়ানক শব্দে ফাটবামাত্র খাদের খানিকটা ধ্বসে গিয়ে কতগুলো লোক চাপা পড়ল। অমনি সকলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "আগে খুকিকে দেখ।" খুকি এক কোণে পুঁটুলি পাকিয়ে দিব্যি ঘুমিয়ে আছে। পরদিন সকালবেলা সকলে খাওয়া-দাওয়া করছে—এমন সময় একজন চেঁচিয়ে উঠল "দেখ, খুকিটা কোথায় গেল"; সকলে চেয়ে দেখে খুকিটা জার্মান খাদের দিকে খুটখুট্ করে হেঁটে যাচ্ছে। জার্মানরা তো ব্যাপার দেখে অবাক্! খানিক বাদে তারা খুকিটাকে ডাকতে লাগল। খুকিও তাদের খাদে গিয়ে অনেক চকলেট লজঞ্চুস্ আদায় ক'রে ভারি খুশি হয়ে ফিরে এল। এম্‌নি করে তারা এক সপ্তাহ কাটাল।

তার পর দু বছর কেটে গেছে—সেই খুকির বাবা-মার কোনো খবর পাওয়া যায় নি। সেই সৈন্যদলই এখনো তাকে খরচ দিয়ে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করছে। অবশ্য এখন সে আর লড়াইয়ের জায়গায় থাকে না—সে থাকে লণ্ডনে—সকলে তার নাম রেখেছে ফিলিস্।

ছয় বীর

সে প্রায় ছয়শত বৎসর আগেকার কথা—সে সময়ে ইংরাজ ও ফরাসিতে প্রায়ই যুদ্ধ চলিত। দুই পক্ষেই বড়ো-বড়ো বীর ছিলেন—তাঁহাদের আশ্চর্য বীরত্বের কাহিনী ইউরোপের দেশ-বিদেশে লোকে অবাক হইয়া শুনিত।

ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় এড্ওয়ার্ড তখন খুব বড়ো সৈন্যদল লইয়া ফ্রান্সে যুদ্ধ করিতেছিলেন। ফ্রান্সের উত্তর দিকে সমুদ্রের উপকূলে ইংলণ্ডের খুব কাছাকাছি একটি শহর আছে, তাহার নাম 'ক্যালে' (Calais)। এই শহরটির উপর বহুকাল ধরিয়া ইংরাজদের চোখ ছিল—কারণ, এইটি দখল করিতে পারিলে, ফ্রান্সে যাওয়া-আসার খুবই সুবিধা হয়। এড্ওয়ার্ড জলস্থল দুইদিক হইতে এই শহরটিকে ঘেরাও করিয়া ফেলিলেন। 'ক্যালে' শহরে সৈন্য-সামন্ত বেশি ছিল না, কিন্তু সেখানকার দুর্গ বড়ো ভয়ানক। তার চারিদিক উঁচু দেয়াল ঘেরা—সেই দেয়ালের বাহিরে প্রকাণ্ড খাল—এক-একটা ফটকের সামনে এক-একটি পোল—সেই পোল দুর্গের ভিতর হইতে গুটাইয়া ফেলা যায়। সে সময়ে কামান ছিল বটে—তাহার গোলাতে মানুষ মরে কিন্তু দুর্গ ভাঙে না। সুতরাং জোর করিয়া দুর্গ দখল করা বড়ো সহজ ছিল না। কিন্তু এড্ওয়ার্ড তাহার জন্য ব্যস্ত হইলেন না—তিনি শহরের পথঘাট আটকাইয়া, প্রকাণ্ড তাম্বু গাড়িয়া দিনের পর দিন নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মতলবটি এই যে, যখন দুর্গের ভিতরের খাবার সব ফুরাইয়া আসিবে আর ভিতরের লোকজন ক্রমে কাহিল হইয়া পড়িবে, তখন তাহারা আপনা হইতেই হার মানিবে; মিছামিছি লড়াই হাঙ্গামা করিবার দরকার হইবে না।

'ক্যালে'র লোকেরা যখন দেখিল, ইংরাজেরা চারিদিক হইতে পথঘাট ঘিরিয়া ফেলিতেছে, তখন তাহারা শিশু, বৃদ্ধ, অক্ষম এবং দুর্বল লোকদিগকে এবং স্ত্রীলোকদিগকে শহরের বাহিরে পাঠাইয়া দিল।

তার পর কিছুদিন ধরিয়া ইংরাজ ও ফরাসিতে রেষারেষি চলিতে লাগিল। ফরাসিদের মতলব, বাহির হইতে দুর্গের ভিতরে খাবার পোঁছাইবে—ইংরাজের চেষ্টা যে সেই খাবার কিছুতেই ভিতরে যাইতে দিবে না। ডাঙার পথে খাবার পোঁছানো একরূপ অসম্ভব ছিল—কারণ, সেদিকে ইংরাজদের খুব কড়াক্কড় পাহারা। সমুদ্রের দিকেও ইংরাজদের যুদ্ধ-জাহাজ সর্বদা ঘোরাঘুরি করিত কিন্তু অন্ধকার রাতে তাহাদের এড়াইয়া, ফরাসি নাবিকেরা মাঝে মাঝে রুটি, মাংস, শাক সব্জি প্রভৃতি শহরের মধ্যে পোঁছাইয়া দিত। মোরঁৎ ও মেস্ত্রিয়েল নামে দুইজন নাবিক এই কাজে আশ্চর্য সাহস ও বাহাদুরি দেখাইয়াছিল। একবার নয়,

দুইবার নয়, তাহারা বহুদিন ধরিয়া এইরকমে সেই শহরে খাবার জোগাইয়াছিল। ইংরাজেরা তাহাদের ধরিবার জন্য কতবার কত চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু প্রতিবারেই তাহারা ইংরাজ জাহাজগুলিকে ফাঁকি দিয়া পলাইত।

এইরকমে ছয়মাস কাটিয়া গেল, তবু দুর্গের লোকেরা দুর্গ ছাড়িয়া দিবার নাম পর্যন্ত করে না। তখন রাজা এড্ওয়ার্ড কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি আরো লোকজন আনাইয়া সমুদ্রের তীরে দুর্গ বানাইলেন, সেখানে খুব জবরদস্ত্ পাহারা বসাইলেন, সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের বড়ো-বড়ো পাথর ছুঁড়িবার যন্ত্র বসাইলেন। নৌকার সাধ্য কি সেদিক দিয়া শহরে প্রবেশ করে! খাবার আসিবার পথ যখন বন্ধ হইতে চলিল, দুর্গের লোকদেরও তখন হইতে ক্ষুধার কষ্ট আরম্ভ হইল, তাহারা দুর্বল হইয়া পড়ায় তাহাদের মধ্যে নানারকম রোগ দেখা দিতে লাগিল। তবু তাহারা মাঝে মাঝে দল বাঁধিয়া ইংরাজদের শিবির হইতে খাবার কাড়িয়া আনিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তাহাতে যেটুকু খাওয়া জুটিত তাহা অতি সামান্য। দুর্গের সৈন্যরা মাসের পর মাস ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করিয়াও, আশ্চর্য তেজের সঙ্গে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিল–তাহাদের এক ভরসা এই যে, ফরাসি রাজা ফিলিপ নিশ্চয়ই সৈন্য-সামন্ত লইয়া তাহাদের সাহায্য করিতে আসিবেন।

একদিন সত্য সত্যই দেখা গেল, শহর হইতে কিছু দূরে ফরাসি সৈন্যদল আসিয়া হাজির হইয়াছে। তাহাদের রঙিন নিশান আর সাদা তাম্বুগুলি দুর্গের লোকেরা যখন দেখিতে পাইল, তখন তাহাদের আনন্দ দেখে কে! তাহারা ভাবিল, আমাদের এত দিনের ক্লেশ সার্থক হইল। যাহা হউক, ফিলিপ আসিয়াই ইংরাজেরা কোথায় কেমনভাবে আছে, তাহার খবর লইয়া দেখিলেন যে, এখান হইতে ইংরাজদের হটানো বড়ো সহজ হইবে না। 'ক্যালে' ঢুকিবার পথ মাত্র দুইটি, একটি একেবারে সমুদ্রের ধারে—সেদিকে ইংরাজের বড়ো-বড়ো যুদ্ধ-জাহাজ চব্বিশ ঘন্টা পাহারা দেয়। আর-একটি পথে পোলের উপর দিয়া নদী পার হইতে হয়—সেই পোলের ইংরাজেরা রীতিমতো দখল জন্মাইয়া বসিয়াছে। পোলের মুখে দুর্গ বসাইয়া বড়ো বড়ো যোদ্ধারা তাহার মধ্যে তীরন্দাজ লইয়া প্রস্তুত রহিয়াছে—তাহারা প্রাণ থাকিতে কেহ পথ ছাড়িবে না। ইহা ছাড়া আর সব জলাভূমি, সেখান দিয়া সৈন্য-সামন্ত পার করা এক দুরূহ ব্যাপার।

ফিলিপ তখন ইংরাজ শিবিরে দূত পাঠাইয়া প্রস্তাব করিলেন, "আইস! তোমরা এক-বার খোলা ময়দানে আসিয়া আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর।" এড্ওয়ার্ড উত্তর দিলেন, "আমি আজ বৎসরখানেক এইখানে অপেক্ষা করিয়া আছি, ইহাতে আমার খরচপত্র যথেষ্ট হইয়াছে এতদিনে দুর্গের লোকেরা কাবু হইয়া আসিয়াছে, এখন তোমার খাতিরে আমি এমন সুযোগ ছাড়িতে প্রস্তুত নই। তোমার রাস্তা তুমি খুঁজিয়া লও।"

তিন দিন ধরিয়া দুই দলে আপসের কথাবার্তা চলিল, কিন্তু তাহাতে কোনোরূপ মীমাংসা হইল না। তখন ফিলিপ অগত্যা তাঁহার সৈন্যদের লইয়া আবার বিনা যুদ্ধেই ফিরিয়া গেলেন। তাঁহাকে ফিরিতে দেখিয়া দুর্গবাসীদের মন একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। এতদিন তাহারা যে ভরসায় সকল কষ্ট ভুলিয়া ছিল, এখন সে ভরসাও আর রহিল না। তখন তাহারা একেবারে নিরাশ হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিল।

এড্‌ওয়ার্ড বলিলেন, "সন্ধি করিতে আমি প্রস্তুত আছি, কিন্তু তোমরা আমায় বড়ো ভোগাইয়াছ, আমার অনেক জাহাজ ডুবিয়াছে, টাকা ও সময় নষ্ট হইয়াছে, এবং অন্য নানা-রকমের ক্ষতি হইয়াছে। আমি ইহার ষোলো-আনা শোধ না লইয়া ছাড়িব না। আমার সন্ধির শর্ত এই,—ক্যালের দুর্গ শহর টাকাকড়ি লোকজন সমস্ত আমার হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে—আমার যেমন ইচ্ছা ফাঁসি, কয়েদ, জরিমানা ইত্যাদি দণ্ডবিধান করিব এবং ইহাও জানিও যে, আমি যে শাস্তি দিব তাহা বড়ো সামান্য হইবে না।"

ইংরাজ দূত যখন ক্যালের লোকেদের এই কথা জানাইল, তাহারা এমন শর্তে সন্ধি করিতে রাজী হইল না। তাহারা বলিল, "রাজা এড্‌ওয়ার্ড স্বয়ং একজন বীরপুরুষ, তাঁহাকে বুঝাইয়া বলুন, তিনি এমন অন্যায় দাবি কখনো করিবেন না।" ইংরাজ দলের ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা তখন তাহাদের পক্ষ লইয়া রাজাকে অনেক বুঝাইলেন। ক্যালের লোকেরা কিরূপ সাহসের সহিত কত কষ্ট সহ্য করিয়া, বীরের মতো দুর্গ রক্ষা করিয়াছে, সে-সকল কথা তাঁহারা বার বার বলিলেন। এমন শত্রুকে যে সম্মান করা উচিত এ কথা এক বাক্যে সকলে স্বীকার করিলেন। কিন্তু এড্‌ওয়ার্ডের প্রতিজ্ঞা অটল। অনেক বলা-কওয়ার পর তিনি একটু নরম হইয়া এই হুকুম দিলেন—"ক্যালের লোকেরা যদি ক্ষমা চায় তবে তাহাদের ছয়জন প্রতিনিধি পাঠাইয়া দিক—তাহারা দুর্গের চাবি লইয়া, খালি পায়ে খালি মাথায় গলায় দড়ি দিয়া আমার কাছে আসুক এবং সকলের হইয়া শাস্তি গ্রহণ করুক। তাহা হইলে আর সকলকে মাপ করিতে পারি, কিন্তু এই ছয়জনের আর রক্ষা নাই।"

ইংরাজ দূত আবার দুর্গে গিয়া এই হুকুম জানাইল। দুর্গের লোকেরা রাজার আদেশ জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল—এই হুকুম শুনিয়া তাহারা স্তব্ধ হইয়া গেল। তখন ক্যালের সম্ভ্রান্ত ধনী বৃদ্ধ সেন্ট পিয়ের বলিয়া উঠিলেন, "বন্ধুগণ, আমার জীবন দিয়া যদি তোমাদের বাঁচাইতে পারি, তবে ইহার চাইতে সুখের মৃত্যু আমি চাহি না। আমি ছয়জনের মধ্যে প্রথম প্রতিনিধিরূপে দাঁড়াইলাম।" এই কথায় চারিদিকে ক্রন্দনের রোল উঠিল—অনেকে সেন্ট পিয়েরের পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আরো পাঁচজন লোক অগ্রসর হইয়া, তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল, "আমরাও মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।" এই দৃশ্য দেখিয়া ইংরাজ দূতের চক্ষে জল আসিল—তিনি বলিলেন, "রাজা এড্‌ওয়ার্ড যাহাতে ইঁহাদের প্রতি সদয় হন, আমি সেজন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব।"

ছয়জন প্রতিনিধিকে রাজার সভায় উপস্থিত করা হইল। তাঁহারা শান্তভাবে রাজার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন। তার পর সেন্ট পিয়ের ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "আমাদের 'ক্যালে'বাসী বন্ধুগণ এতদিন অসহ্য দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া দুর্গ রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের অযোগ্য প্রতিনিধি আমরা, আজ তাঁহাদের জীবনরক্ষার জন্য দুর্গের চাবি আপনার কাছে দিতেছি। এখন আমরা সম্পূর্ণভাবে আপনার ইচ্ছা ও আদেশের অধীনে রহিলাম।"

সভাসুদ্ধ লোকে স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। ছয়জনের সকলেই বয়সে বৃদ্ধ; বহুদিন অনাহারে তাঁহাদের শরীর শুকাইয়া গিয়াছে, তাহাদের গম্ভীর প্রশান্ত মুখে কষ্টের রেখা পড়িয়াছে, এক-একজন এত দুর্বল যে, চলিতে পা কাঁপে, অথচ তাঁহাদের মন

এখনো তেজে পরিপূর্ণ। তাঁহাদের দেখিয়া ইংরাজ যোদ্ধাগণের মনে শ্রদ্ধার উদয় হইল। সকলেই বলিতে লাগিল, "ইহাদের উপর শাস্তি দিয়া প্রতিশোধ লওয়া কখনই উচিত নয়।" যিনি দূত হইয়া গিয়াছিলেন তিনি বলিলেন, "ইহাদের শাস্তি দিলে রাজা এড্ওয়ার্ডের কলঙ্ক হইবে—ইংরাজ জাতির কলঙ্ক হইবে।" কিন্তু এড্ওয়ার্ডের মন গলিল না—তিনি জল্লাদ ডাকিতে হুকুম দিলেন। তখন ইংলণ্ডের রানী ফিলিপা বন্দীদের মধ্যে কাঁদিয়া পড়িলেন এবং দুই হাত তুলিয়া ভগবান যীশুর দোহাই দিয়া এড্ওয়ার্ডকে বলিলেন, "ইহাদের তুমি ছাড়িয়া দাও।" তখন এড্ওয়ার্ড আর 'না' বলিতে পারিলেন না।

ছয় বীরকে মুক্তি দিয়া রানী তাহাদিগকে তাঁহার নিজের বাড়িতে লইয়া, পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইলেন এবং নানা উপহার দিয়া বিদায় দিলেন। ইঁহাদের বীরত্বের কথা ফরাসিরা আজও ভোলেন নাই—ইংরাজও তাহা স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন।

একটি বর

একটি অন্ধ ভিখারী রোজ মন্দিরে পূজা করতে যায়। প্রতিদিন ভক্তিভরে পূজা শেষ করে মন্দিরের দরজায় প্রণাম করে ফিরে আসে; মন্দিরের পুরোহিত সেটা ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেন।

এইভাবে কত বৎসর কেটে গেছে কেউ জানে না। একদিন পুরোহিত ভিখারীকে ডেকে বললেন, "দেখ হে! দেবতা তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। তুমি কোনো একটা বর চাও! কিন্তু, মনে রেখো—একটিমাত্র বর পাবে।"

ভিখারী বেচারা বড়ো মুস্কিলে পড়ল! কি যে চাইবে, কিছু আর ঠিক করতে পারে না। একবার ভাবল, দৃষ্টি ফিরে চাইবে; আবার ভাবল, টাকাকড়ি চাইবে; আবার ভাবল, আত্মীয়স্বজন ছেলেপিলে দীর্ঘ জীবন এই-সব চাইবে, কিছুতেই আর ঠিক করতে পারে না। তখন সে বলল, "আচ্ছা, আমি কাল ভাল করে ভেবে এসে বর চাইব। এখন কিছুতেই ঠিক করতে পারছি না, কি চাই।"

অনেক ভেবেচিন্তে সে মনে মনে একটা ঠিক করে নিল। তার পর মন্দিরে গিয়ে পুরোহিতকে বলল, "পুরুত ঠাকুর! আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি—আপনি আমার বড়ো উপকার করলেন। যে একটি বরের কথা বলেছেন সেটি এখন আমি চাইব—মনে রাখবেন, একটিমাত্র বর আমি চাচ্ছি। আমি এই বর চাই যে মরবার আগে যেন আমার নাতিকে ছয়তলা বাড়ির মধ্যে বসে সোনার থালায় পায়স খেতে স্বচক্ষে দেখে যেতে পারি।"

এই এক বরে ভিখারী চোখের দৃষ্টি ফিরে পেল, ধনজন পেল, ছেলেপিলে, নাতি-নাতনি পেল, দীর্ঘজীবন পেল।

হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি

প্রফেসর হুঁশিয়ার আমাদের উপর ভারি রাগ করেছেন। আমরা সেকালের জীবজন্তু সম্বন্ধে নানাকথা ছাপিয়েছি ; কিন্তু কোথাও তাঁর অদ্ভুত শিকার কাহিনীর কোনো উল্লেখ করি নি। সত্যি এ আমাদের ভারি অন্যায়। আমরা সে-সব কাহিনী কিছুই জানতাম না। কিন্তু প্রফেসর হুঁশিয়ার তাঁর শিকারের ডায়েরি থেকে কিছু কিছু উদ্ধার করে আমাদের পাঠিয়েছেন। আমরা তারই কিছু কিছু ছাপিয়ে দিলাম। এ-সব সত্যি কি মিথ্যা তা তোমরা বিচার করে নিয়ো।

"২৬শে জুন, ১৯২২—কারাকোরম্‌, বন্দাকুশ পাহাড়ের দশ মাইল উত্তর। আমরা এখন সবসুদ্ধ দশজন—আমি, আমার ভাগ্নে চন্দ্রখাই, দুইজন শিকারী (ছক্কড় সিং আর লক্কড় সিং) আর ছয়জন কুলি। আমার কুকুরটাও সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে।

"নদীর ধারে তাঁবু খাটিয়ে জিনিসপত্র সব কুলিদের জিম্মায় দিয়ে, আমি, চন্দ্রখাই আর শিকারী দুজনকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে বন্দুক, ম্যাপ আর একটা মস্ত বাক্স, তাতে আমাদের যন্ত্রপাতি আর খাবার জিনিস। দুঘন্টা পথ চলে আমরা এক জায়গায় এলাম, সেখানকার সবই কেমন অদ্ভুতরকম। বড়ো-বড়ো গাছ, তার একটারও নাম আমরা জানি না। একটা গাছে প্রকাণ্ড বেলের মতো মস্ত-মস্ত লাল রঙের ফল ঝুলছে; একটা ফুলের গাছ দেখলাম, তাতে হলদে সাদা ফুল হয়েছে, এক-একটা দেড় হাত লম্বা। আর-একটা গাছে ঝিঙের মতো কি সব ঝুলছে, পঁচিশ হাত দূর থেকে তার ঝাঁঝালো গন্ধ পাওয়া যায়। আমরা অবাক হয়ে এই-সব দেখছি, এমন সময় হঠাৎ হুপ্‌হাপ্‌ গুব্‌গাপ্‌ শব্দে পাহাড়ের উপর থেকে ভয়ানক একটা কোলাহল শোনা গেল।

"আমি আর শিকারী দুজন তৎক্ষণাৎ বন্দুক নিয়ে খাড়া ; কিন্তু চন্দ্রখাই বাক্স থেকে দুই টিন জ্যাম বের করে নিশ্চিন্তে বসে খেতে লাগল। ঐটে তার একটা মস্ত দোষ ; খাওয়া পেলে তার আর বিপদ আপদ কিছুই জ্ঞান থাকে না। এইভাবে প্রায় মিনিট দুই দাঁড়িয়ে থাকবার পর লক্কড় সিং হঠাৎ দেখতে পেল হাতির চাইতেও বড়ো একটা জন্তু গাছের উপর থেকে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে। প্রথমে দেখে মনে হল একটা প্রকাণ্ড মানুষ, তার পর মনে হল মানুষ নয় বাঁদর, তার পর দেখি মানুষও নয়, বাঁদরও নয়—একেবারে নতুন রকমের জন্তু। সে লাল লাল ফলগুলোর খোসা ছাড়িয়ে খাচ্ছে আর আমাদের দিকে ফিরে ফিরে ঠিক মানুষের মতো করে হাসছে। দেখতে দেখতে পঁচিশ-ত্রিশটা ফল সে টপাটপ্‌ খেয়ে শেষ করল। আমরা এই সুযোগে তার কয়েকখানা ছবি তুলে ফেললাম। তার পর চন্দ্রখাই ভরসা করে এগিয়ে গিয়ে তাকে কিছু খাবার দিয়ে আসল। জন্তুটা মহা খুশি হয়ে এক গ্রাসে আস্ত একখানা পাঁউরুটি আর প্রায় আধসের গুড় শেষ করে, তার পর পাঁচ-সাতটা সিদ্ধ ডিম খোলাসুদ্ধ কড়মড়িয়ে খেয়ে ফেলল। একটা টিনে করে গুড় দেওয়া হয়েছিল, সেই টিনটাও সে খাবার মতলব করেছিল, কিন্তু খানিকক্ষণ চিবিয়ে হঠাৎ বিশ্রী মুখ করে সে

কান্নার সুরে গাঁও গাঁও শব্দে বিকট চীৎকার করে জঙ্গলের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল। আমি জন্তুটার নাম দিয়েছি হ্যাংলাসেরিয়াম্।"



"২৪শে জুলাই, ১৯২২—বন্দাকুশ পাহাড়ের একুশ মাইল উত্তর। এখানে এত দেখবার জিনিস আছে, নতুন নতুন এত-সব গাছপালা জীবজন্তু, যে তারই সন্ধান করতে আর নমুনা সংগ্রহ করতে আমাদের সময় কেটে যাচ্ছে। দুশোরকম পোকা আর প্রজাপতি আর পাঁচশো রকম গাছপালা ফুলফল সংগ্রহ করেছি ; আর ছবি যে কত তুলেছি তার সংখ্যাই হয় না। একটা কোনো জ্যান্ত জানোয়ার ধরে সঙ্গে নেয়ার ইচ্ছা দেখা যাক কতদূর কি হয়। সেবার যখন কট্‌ক টোডন্ আমায় তাড়া করেছিল, তখন সে কথা কেউ বিশ্বাস করে নি। এবার তাই জলজ্যান্ত প্রমাণ সংগ্রহ করে নিচ্ছি।

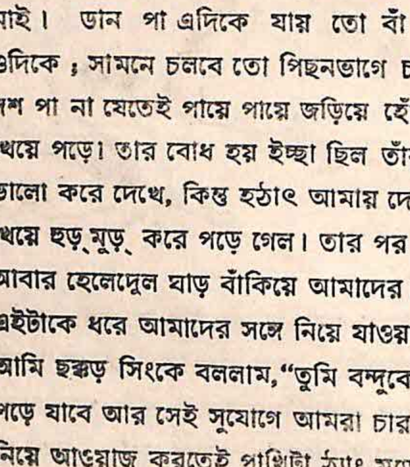
"আমরা যখন বন্দাকুশ পাহাড়ে উঠেছিলাম, তখন পাহাড়টা কত উঁচু তা মাপা হয় নি। সেদিন জরীপের যন্ত্র দিয়ে আমি আর চন্দ্রখাই পাহাড়টাকে মেপে দেখলাম। আমার হিসাবে হল ষোলোহাজার ফুট। কিন্তু চন্দ্রখাই হিসাব করল বেয়াল্লিশহাজার। তাই আজ আবার সাবধানে দুজনে মিলে মেপে দেখলাম, এবার হল মোটে দুহাজার সাতশো ফুট। বোধ হয় আমাদের যন্ত্রে কোনো দোষ হয়ে থাকবে! যাহোক এটা নিশ্চয় যে এপর্যন্ত ঐ পাহাড়ের চুড়োয় আর কেউ ওঠে নি। এ-এক সম্পূর্ণ অজানা দেশ, কোথাও জন মানুষের চিহ্নমাত্র নাই, নিজেদের ম্যাপ নিজেরা তৈরি করে পথ চলতে হয়।

"আজ সকালে এক কাণ্ড হয়ে গেছে। লক্কড় সিং একটা গাছে হলদে রঙের ফল ফলেছে দেখে তারই একটুখানি খেতে গিয়েছিল। এক কামড় খেতেই হঠাৎ হাত-পা খিঁচিয়ে সে আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে ছট্‌ফট্ করতে লাগল। তাই দেখে ছক্কড় সিং "ভাইয়া রে, ভাইয়া" বলে কেঁদে অস্থির। যাহোক মিনিট দশেক ঐরকম হাত-পা ছুঁড়ে লক্কড় সিং একটু ঠাণ্ডা হয়ে উঠে বসল। তখন আমাদের চোখে পড়ল যে একটা জন্তু কাছেই ঝোপের আড়াল থেকে অত্যন্ত বিরক্ত মতন মুখ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চেহারা দেখলে মনে হয় যে, সংসারে তার কোনো সুখ নেই, এ-সব গোলমাল কান্নাকাটি কিছুই তার পছন্দ হচ্ছে না। আমি তার নাম দিয়েছি গোমড়াথেরিয়াম্। এমন খিট্‌খিটে খুঁতখুঁতে গোমরা মেজাজের জন্তু আর আমরা দ্বিতীয় দেখি নি। আমরা তাকে তোয়াজ টোয়াজ করে খাবার দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করেছিলাম। সে অত্যন্ত বিশ্রী মতো মুখ করে, ফোঁস্ ফোঁস্ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে অনেক আপত্তি জানিয়ে, আধখানা পাঁউরুটি আর দুটো কলা খেয়ে

তার পর একটুখানি পেয়ারার জেলি মুখে দিতেই এমন চটে গেল যে রেগে সারা গায়ে জেলি আর মাখন মাখিয়ে আমাদের দিকে পিছন ফিরে মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগল।"



"১৪ই আগস্ট, বন্দাকুশ পাহাড়ের পঁচিশ মাইল উত্তর—ট্যাপ্ ট্যাপ্ থ্যাপ্ থ্যাপ্ ঝুপ্ ঝাপ্—সকালবেলায় খেতে বসেছি, এমন সময় এইরকম একটা শব্দ শোনা গেল। একটুখানি উঁকি মেরে দেখি আমাদের তাঁবুর কাছে প্রায় উটপাখির মতন বড়ো একটা অদ্ভুতরকম পাখি অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে কোন দিকে চলবে তার কিছুই যেন ঠিক-ঠিকানা নাই। ডান পা এদিকে যায় তো বাঁ পা ওদিকে ; সামনে চলবে তো পিছনভাগে চায়, দশ পা না যেতেই পায়ে পায়ে জড়িয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে। তার বোধ হয় ইচ্ছা ছিল তাঁবুটা ভালো করে দেখে, কিন্তু হঠাৎ আমায় দেখতে পেয়ে সে এমন ভড়কে গেল যে তক্ষুনি হুমড়ি খেয়ে হুড়্মুড়্ করে পড়ে গেল। তার পর এক ঠ্যাঙে লাফাতে লাফাতে প্রায় হাত দশেক গিয়ে আবার হেলেদুল ঘাড় বাঁকিয়ে আমাদের দেখতে লাগল। চন্দ্রখাই বলল, "ঠিক হয়েছে, এইটাকে ধরে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাক।" তখন সকলের উৎসাহ দেখে কে! আমি ছক্কড় সিংকে বললাম, "তুমি বন্দুকের আওয়াজ কর, তা হলে পাখিটা নিশ্চয়ই চমকে পড়ে যাবে আর সেই সুযোগে আমরা চার-পাঁচজন তাকে চেপে ধরব! ছক্কড় সিং বন্দুক নিয়ে আওয়াজ করতেই পাখিটা ঠ্যাং মুড়ে মাটির উপর বসে পড়ল, আর আমাদের দিকে তাকিয়ে ক্যাট্ ক্যাট্ শব্দ করে ভয়ানক জোরে ডানা ঝাপ্টাতে লাগল। তাই দেখে আমাদের আর এগুতে সাহস হল না। কিন্তু লক্কড় সিং হাজার হোক তেজী লোক, সে দৌড়ে গিয়ে পাখিটার বুকে ধাঁই করে এক ছাতার বাড়ি বসিয়ে দিল। ছাতার বাড়ি খেয়ে পাখিটা তৎক্ষণাৎ দুই পা ফাঁক করে উঠে দাঁড়াল। তার পর লক্কড় সিং-এর দাড়িতে কামড়ে ধরে তার ঘাড়ের উপর দুই পা দিয়ে ঝুলে পড়ল। ভাইয়ের বিপদ দেখে ছক্কড় সিং বন্দুকেরবাঁট দিয়ে পাখিটার মাথাটা থেঁৎলে দেবার আয়োজন করেছিল।

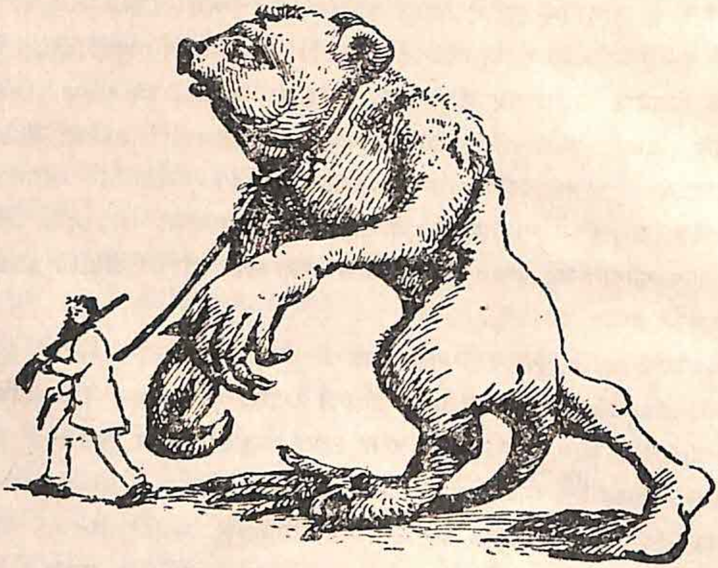


কিন্তু সে আঘাতটা পাখিটার মাথায় লাগল না, লাগল গিয়ে লক্কড় সিং-এর বুকে। তাতে পাখিটা ভয় পেয়ে লক্কড় সিংকে ছেড়ে দিল বটে, কিন্তু দুই ভাইয়ে এমন মারামারি বেধে

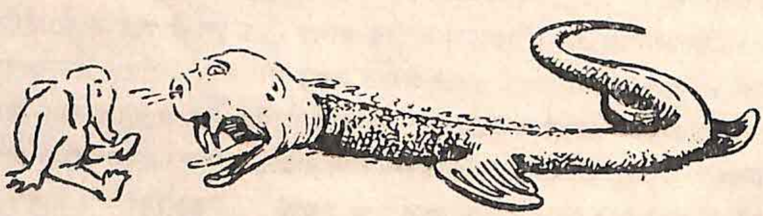
উঠল যে আমরা ভাবলাম দুটোই এবার মরে বুঝি। দুজনের তেজ কি তখন! আমি আর দুজন কুলি ছক্কড় সিং-এর জামা ধরে টেনে রাখছি, সে আমাদের সুদ্ধ হিঁচড়ে নিয়ে ভাইয়ের নাকে ঘুঁষি চালাচ্ছে। চন্দ্রখাই রীতিমতো ভারিক্কে মানুষ; সে ছক্কড় সিং-এর কোমর ধরে লটকে আছে, ছক্কড় সিং তাইসুদ্ধ মাটি থেকে তিন হাত লাফিয়ে উঠে বন্‌বন্ করে বন্দুক ঘোরাচ্ছে। হাজার হোক পাঞ্জাবের লোক কি না। মারামারি থামাতে গিয়ে সেই ফাঁকে পাখিটা যে কখন পালালো তা আমরা টেরই পেলাম না। যা হোক এই ল্যাগ্‌ব্যাগ পাখি বা ল্যাগ-ব্যাগর্নিসের কতকগুলো পালক আর কয়েকটা ফোটোগ্রাফ সংগ্রহ হয়েছিল। তাতেই যথেষ্ট প্রমাণ হবে।"

"১লা সেপ্টেম্বর, কাঁকড়ামতী নদীর ধারে—আমাদের সঙ্গের খাবার ইত্যাদি ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে। তরিতরকারি যা ছিল, তা তো আগেই ফুরিয়েছে। টাটকা জিনিসের মধ্যে সঙ্গে কতগুলো হাঁস আর মুরগী আছে, তারা রোজ কয়েকটা করে ডিম দেয়, তা ছাড়া খালি বিস্কুট, জ্যাম, টিনের দুধ আর ফল, টিনের মাছ, আর মাংস। এই-সব কয়েক সপ্তাহের মতো আছে, সুতরাং এই কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের ফিরতে হবে। আমরা এই সব জিনিস গুনছি আর সাজিয়ে গুছিয়ে রাখছি, এমন সময় ছক্কড় সিং বলল, যে লক্কড় সিং ভোরবেলা কোথায় বেরিয়েছে, এখন পর্যন্ত ফেরে নি। আমরা বললাম, "ব্যস্ত কেন, সে আসবে এখন। যাবে আবার কোথায়? কিন্তু তার পরেও দুই-তিন ঘণ্টা গেল অথচ লক্কড় সিং-এর দেখা পাওয়া গেল না। আমরা তাকে খুঁজতে বেরুবার পরামর্শ করছি, এমন সময় হঠাৎ একটা ঝোপের উপর দিয়ে একটা প্রকাণ্ড জানোয়ারের মাথা দেখা গেল। মাথাটা উঠছে নামছে আর মাতালের মতো টলছে। দেখেই আমরা সুড়্‌সুড়্ করে তাঁবুর আড়ালে পালাতে যাচ্ছি, এমন সময় শুনলাম লক্কড় সিং চেঁচিয়ে বলছে, "পালিয়ো না, পালিয়ো না, ও কিছু বলবে না।" তার পরের মুহূর্তেই দেখি লক্কড় সিং বুক ফুলিয়ে সেই ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। তার পাগড়ীর কাপড় দিয়ে সে ঐ অত বড়ো জানোয়ারটাকে বেঁধে নিয়ে এসেছে। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে লক্কড় সিং বলল, যে সে সকালবেলায় কুঁজো নিয়ে নদী থেকে জল আনতে গিয়েছিল। ফিরবার সময় এই জন্তুটার সঙ্গে তার দেখা। তাকে দেখেই জন্তুটা মাটিতে শুয়ে কোঁ-কোঁ শব্দ করতে লাগল। সে দেখল জন্তুটার পায়ে কাঁটা ফুটেছে আর তাই দিয়ে দর্‌দর্ করে রক্ত পড়ছে। লক্কড় সিং খুব সাহস করে তার পায়ের কাঁটাটি তুলে, বেশ করে মুছে, নিজের রুমাল দিয়ে বেঁধে দিল। তার পর জানোয়ারটা তার সঙ্গে সঙ্গে আসছে দেখে সে তাকে পাগড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে এসেছে। আমরা সবাই বললাম, "তা হলে ওটা ঐরকম বাঁধাই থাক, দেখি ওটাকে সঙ্গে করে দেশে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা।" জন্তুটার নাম রাখা গেল ল্যাংড়াথেরিয়াম্।

"সকালে তো এই কাণ্ড হল; বিকালবেলা আর এক ফ্যাসাদ উপস্থিত। তখন আমরা সবেমাত্র তাঁবুতে ফিরেছি। হঠাৎ আমাদের তাঁবুর বেশ কাছেই একটা বিকট চীৎকারের শব্দ শোনা গেল। অনেকগুলো চিল আর পেঁচা একসঙ্গে চেঁচালে যেরকম আওয়াজ হয়, কতকটা সেইরকম। ল্যাংড়া থেরিয়ামটা ঘাসের উপর শুয়ে শুয়ে একটা গাছের লম্বা-লম্বা পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছিল; চীৎকার শুনবামাত্র সে, ঠিক শেয়াল যেমন করে ফেউ ডাকে সেই-



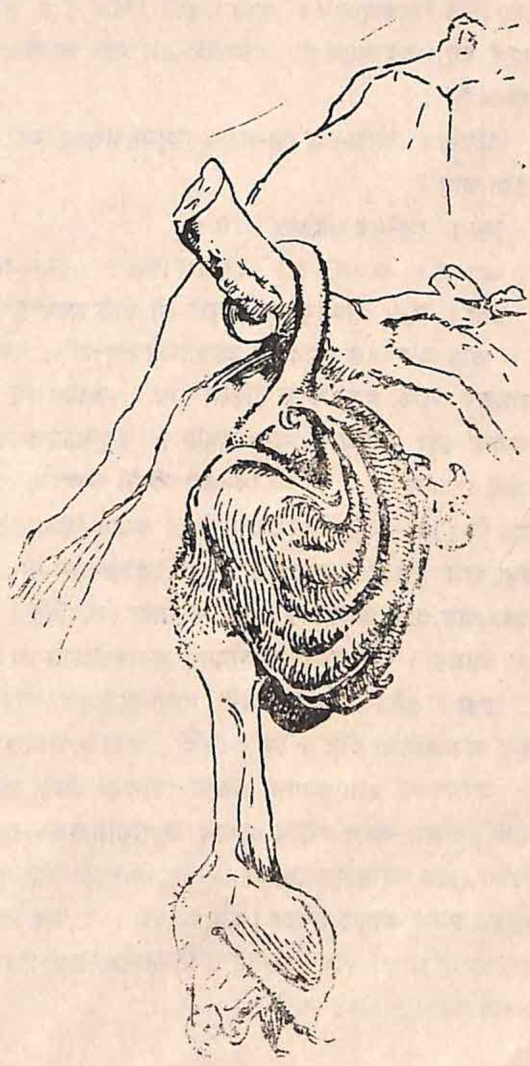
রকম ধরনের একটা বিকট শব্দ করে, বাঁধন-টাঁধন ছিঁড়ে, কতক লাফিয়ে কতক দৌড়িয়ে এক মুহূর্তের মধ্যে গভীর জঙ্গলের ভিতর মিলিয়ে গেল। আমরা ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে না পেরে, ভয়ে ভয়ে খুব সাবধানে এগিয়ে গিয়ে দেখি, একটা প্রকাণ্ড জন্তু—সেটা কুমিরও নয়, সাপও নয়, মাছও নয়, অথচ তিনটারই কিছু কিছু আদল আছে—সে এক হাত মস্ত হাঁ করে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে ; আর একটা ছোটো নিরীহ গোছের কি যেন জানোয়ার হাত-পা এলিয়ে ঠিক তার মুখের সামনে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। আমরা মনে করলাম যে, এইবার



বেচারাকে খাবে বুঝি, কিন্তু পাঁচ মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল, কেবল চীৎকারই চলতে লাগল ; খাবার কোনো চেষ্টাই দেখা গেল না। লক্কড় সিং বলল, "আমি ওটাকে গুলি করি।" আমি বললাম, "কাজ নেই, গুলি যদি ঠিকমতো না লাগে, তা হলে জন্তুটা ক্ষেপে গিয়ে কি জানি করে বসবে, তা কে জানে?" এই বলতে বলতেই ধেড়ে জন্তুটা চীৎকার থামিয়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে নদীর দিকে চলে গেল। চন্দ্রখাই বলল, "এ জন্তুটার নাম দেওয়া থাক চিল্লানোসরাস্।" ছক্কড় সিং বলল, "উ বাচ্চাকো নাম দেও, বেচারাথেরিয়াম্।"

"৭ই সেপ্টেম্বর, কাঁকড়ামতী নদীর ধারে—নদীর বাঁক ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা পাহাড়ের একেবারে শেষ কিনারায় এসে পড়েছি। আর কোনোদিকে এগোবার জো নাই। দেওয়ালের মতো খাড়া পাহাড় ; সোজা দুশো তিনশো হাত নীচে সমতল জমি পর্যন্ত নেমে

গিয়েছে। যেদিকে তাকাই সেই দিকেই এরকম। নীচের যে সমতল জমি সে একেবারে মরুভূমির মতো; কোথাও গাছপালা, জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নাই। আমরা একেবারে পাহাড়ের কিনারায় ঝুঁকে এই-সব দেখছি, এমন সময় আমাদের ঠিক হাত পঞ্চাশেক নীচেই কি যেন ধড়্‌ফড়্‌ করে উঠল। দেখলাম বেশ একটা মাঝারি গোছের তিমি মাছের মতো মস্ত কি একটা জন্তু পাহাড়ের গায়ে আঁকড়ে ধরে বাদুড়ের মতো মাথা নিচু করে ঘুমাচ্ছে। তখন এদিক-ওদিক তাকিয়ে এইরকম আরো পাঁচ-সাতটা জন্তু দেখতে পেলাম। কোনোটা ঘাড় গুঁজে ঘুমাচ্ছে, কোনোটা লম্বা গলা ঝুলিয়ে দোল খাচ্ছে, আর অনেক দূরে একটা পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে ঠোঁট ঢুকিয়ে কি যেন খুঁটে খুঁটে বের করে খাচ্ছে। এইরকম দেখছি এমন সময় হঠাৎ কট্‌ কটাং কট্‌ শব্দ করে সেই প্রথম জন্তুটা হুড়ুৎ করে ডানা মেলে একেবারে সোজা আমাদের দিকে উড়ে আসতে লাগল। ভয়ে আমাদের হাত-পাগুলো গুটিয়ে আসতে লাগল; এমন বিপদের সময় যে পালানো দরকার, তা পর্যন্ত আমরা ভুলে গেলাম। জন্তুটা মুহূর্তের মধ্যে একেবারে আমাদের মাথার উপরে এসে পড়ল। তার পর কি যে হল তা আমার ভালো করে মনে নাই—খালি একটু-একটু মনে পড়ে, একটা অসম্ভব বিটকেল গন্ধের সঙ্গে ঝড়ের মতো ডানা ঝাপটানো আর জন্তুটার ভয়ানক কট্‌ কটাং আওয়াজ। একটুখানি ডানার ঝাপটা আমার গায়ে লেগেছিল তাতেই আমার দম বেরিয়ে প্রাণ বের হবার জোগাড় করেছিল। অন্যসকলের অবস্থাও সেইরকম অথবা তার চাইতেও খারাপ। যখন আমার হুঁশ হল তখন দেখি সকলেরই গা বেয়ে রক্ত পড়ছে। ছক্কড় সিং-এর একটা চোখ ফুলে প্রায় বন্ধ হবার জোগাড় হয়েছে, লক্কড় সিং-এর বাঁ হাতটা এমন মচকে



গিয়েছে যে সে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে, আমারও সমস্ত বুকে পিঠে বেদনা ধরে গিয়েছে ; কেবল চন্দ্রখাই এক হাতে রুমাল দিয়ে কপালের আর ঘাড়ের রক্ত মুছছে, আর-এক হাতে একমুঠো বিস্কুট নিয়ে খুব মন দিয়ে খাচ্ছে। আমরা তখনই আর বেশি আলোচনা না করে জিনিসপত্র গুটিয়ে বন্দাকুশ পাহাড়ের দিকে ফিরে চললাম।"

[প্রফেসর হুঁশিয়ারের ডায়েরি এইখানেই শেষ। কিন্তু আমরা আরো খবর জানবার জন্য তাঁকে চিঠি লিখেছিলাম। তার উত্তরে তিনি তাঁর ভাগ্নেকে পাঠিয়ে দিয়ে লিখলেন, "এর কাছেই সব খবর পাবে।" চন্দ্রখাই-এর সঙ্গে আমাদের যে কথাবার্তা হয় খুব সংক্ষেপে তা হচ্ছে এই—

আমরা। আপনারা যে-সমস্ত নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন সে-সব কোথায় গেলে দেখতে পাওয়া যায় ?

চন্দ্র। সে-সব হারিয়ে গেছে।

আমরা। বলেন কি! হারিয়ে গেল ? এমন সব জিনিস হারিয়ে ফেললেন!

চন্দ্র। হ্যাঁ, প্রাণটুকু যে হারায় নি তাই যথেষ্ট। সে-দেশের ঝড় তো আপনারা দেখেন নি। তার এক-এক ঝাপটায় আমাদের যন্ত্রপাতি, বড়ো-বড়ো তাঁবু আর নমুনার বাক্স, সব কাগজের মতো হুস্ করে উড়িয়ে নেয়। আমাকেই তো পাঁচ-সাতবার উড়িয়ে নিয়েছিল। একবার তো ভাবলাম মরেই গেছি। কুকুরটাকে যে কোথায় উড়িয়ে নিল, সে তো আর খুঁজেই পেলাম না। সে যা বিপদ! কাঁটা কম্পাস, প্ল্যান ম্যাপ, খাতাপত্র, কিছুই আর বাকি রাখে নি। কি করে যে ফিরলাম, তা শুনলে আপনার ঐ চুল দাড়ি সব সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠবে। আধপেটা খেয়ে, কোনোদিন না খেয়ে, আন্দাজে পথ চলে, দুই সপ্তাহের রাস্তা পার হতে আমাদের পুরো তিনমাস লেগেছিল।

আমরা। তা হলে আপনাদের প্রমাণ-টমান যা কিছু ছিল সব নষ্ট হয়েছে ?

চন্দ্র। এই তো আমি রয়েছি, মামা রয়েছেন, আবার কি প্রমাণ চাই, আর এই আপনাদের জন্য কতকগুলো ছবি এঁকে এনেছি ; এতেও অনেকটা প্রমাণ হবে।

আমাদের ছাপাখানার একটা ছোকরা ঠাট্টা করে বলল, "আপনি কোন থেরিয়াম ?" আর-একজন বলল, "উনি হচ্ছেন গপ্পথেরিয়াম—বসে বসে গপ্প মারছেন।" শুনে চন্দ্রখাই ভীষণ রেগে আমাদের টেবিল থেকে একমুঠো চীনেবাদাম আর গোটা আস্টেক পান উঠিয়ে নিয়ে গজ্‌গজ্ করতে করতে বেরিয়ে গেল। ব্যাপার তো এই। এখন তোমরা কেউ যদি আরো জানতে চাও, তা হলে আমাদের ঠিকানায় প্রফেসর হুঁশিয়ারকে চিঠি লিখলে আমরা তার জবাব আনিয়ে দিতে পারি।]